বারুণী

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্
সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ
ইত্যাদি প্রণীত।

১৩২২

মূল্য এক টাকা।

সূচী

বারুণী

"নাঃ! এ মেয়েটার জ্বালায় আর বাঁচি না।" এই বলিয়া নীরদাসুন্দরী সরোষে নিজ কন্যাকে ধরিয়া পূজার ঘর বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে ধীরভাবে পূজার উপকরণগুলি সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মেয়ে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া কাঁদিবার পর তিন বৎসরের বালিকা বারুণী কাঁদিতে কাঁদিতে "মা, মা" বলিয়া ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া দরজা ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মা তাহাতে কর্ণপাত না করায় শেষে অভিমান করিয়া দরজার সাম্‌নে মাটিতে শুইয়া পড়িল, ও হাত পা ছুঁড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দুগাছি-মল-পরা পায়ে কপাটে লাথি মারিতে লাগিল।

হরনাথবাবু স্নান সমাপন করিয়া চেলীর কাপড়খানি পরিয়া নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিতে আসিতে কন্যার ঐ অবস্থা দর্শন করিলেন। তিনি "কি হয়েছে মা? কি হয়েছে মা?" বলিয়া আদর করিয়া বারুণীকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলেন। কিন্তু বাপের এই আদরে মেয়ের অভিমান আরও বর্দ্ধিত হইল, ও সে হাত পা ছুঁড়িয়া কোল হইতে নামিয়া পড়িবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল।

নীরদাসুন্দরী এই সময় দ্বার খুলিয়া দিলেন। হরনাথবাবু বলিলেন, "কি হ'ল কি; খুকী এত কাঁদ্‌ছে কেন?"

নীরদাসুন্দরী ...স্ত বিরক্তভাবে বলিলেন, "আঃ, দেখনা! সকাল থেকে কোনও কাজ কর্‌তে দিচ্ছে না। খালি ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্। ঠাকুরের ঘরের কাজ কর্‌তে এলুম, তা এখানে এসে জ্বালাতন আরম্ভ কর্‌লে। যত বলি ছুঁস্‌নি ছুঁস্‌নি, তত মেয়ের দৌরাত্ম্যি বাড়ে। 'ঘণ্টা নেব,' 'কোশা নেব' করে ত খানিকটা জ্বালালে; তারপর নৈবেদ্যের ফল খাবার জন্যে একেবারে কুরুক্ষেত্র লাগিয়ে দিলে। তোমার পূজার সময় হয়েছে, তাই ঘরের দরজাটা দিয়ে কাজ সেরে রাখ্‌ছি। তাতেই মেয়ের এই কান্না।"

হরনাথবাবু বলিলেন, "একটু ভুলিয়ে রাখ্‌লেই হয়। ছেলেমানুষ—ওর কি আর জ্ঞান আছে? চুপ্ কর্ মা, চুপ কর্। তুই কি নিবি? কোন্‌টা খাবি?"

বারুণী রোরোদ্যমান কণ্ঠে নৈবেদ্যের উপর স্থাপিত একটি শশার দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া বলিল "ঐটে।"

হরনাথবাবু সেইটি নৈবেদ্য হইতে তুলিয়া তাহার হাতে দিতে গিয়া বলিলেন, "এই নে, চুপ্ কর্।"

নীরদাসুন্দরী বলিলেন, "ওকি কর? আমাদের শশাগাছে প্রথম ফলেছে। ঠাকুরকে দেব বলে মানত্ করে রেখেছি। ওকে আগে খাইও না।"

হরনাথ বাবু কোনও উত্তর না করিয়া শশাটি বারুণীর হাতে দিলেন। বারুণীর কান্না থামিয়া গেল। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে শশাটি সাগ্রহে খাইতে লাগিল।

"আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথাটা: একেবারে খেলে" সক্রোধ কণ্ঠে এই কথা বলিয়া নীরদাসুন্দরী হাতের চুড়ি ও আঁচলের চাবির গোছায় ঝনৎকার তুলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মেয়েটি লইয়া নীরদাসুন্দরী বাস্তবিকই বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। চাঁপা ফুলের মত রং ও মাথাভরা কাল কাল চুল দেখিয়া পাড়ার সকলেই বারুণীকে কোলে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। মেয়েটির আধ-আধ কথা শুনিতে ও গোল গোল ছোট হাত তুলিয়া নাচ দেখিতে অনেকেই সন্দেশ, মোয়া বা মুড়কী সঞ্চয় করিয়া রাখিত। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের ছোট পাড়াখানি বারুণীর হাস্যকলরোল ও চীৎকারে মুখরিত হইয়া থাকিত। কথাও সে অনেক শিখিয়াছিল। দিন রাত্রি তাহার আর কথার কামাই ছিল না। কেহ বুঝিতে পারুক আর না পারুক সে সঙ্গত প্রশ্নের অসঙ্গত উত্তর দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইত না। পাড়ার সকলেই এই ছোট মেয়েটিকে কোলে ও বুকে করিবার জন্য লালায়িত হইত। নিজেদের

সন্তান থাকিলেও এই সুন্দরী বালিকাটি কোন্ মায়াবলে তাহাদের মন কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা তাহারা নিজেই জানিত না। সকলের আদরে মেয়েটি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অভি-মানিনী হইয়া পড়িয়াছিল। একটু অনাদর পাইলে বা কাহারও ভ্রূকুটি দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হইত। তাহার মাতার তিরস্কারও সহ্য হইত না।

নীরদাসুন্দরী যে তাঁহার মেয়েকে ভালবাসিতেন না তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার রাগটা বড় শীঘ্রই হইয়া পড়িত ও অন্যায় আদর আবদার তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। হরনাথবাবু পল্লীর জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য বেতনে চাকরি করিতেন। মোকর্দ্দমা তদ্বির উপলক্ষে প্রায়ই তাঁহাকে সদরে যাইতে হইত। সেইজন্য মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিনই খুব সকাল বেলায় তাঁহার ভাত রাঁধিয়া দিতে হইত। নীরদাসুন্দরীকে সেজন্য অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সেই সকল আয়োজন করিতে হইত। মেয়েটিও খুব ভোরে উঠিত, ও বাবার বিছানার উপর পড়িয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত খানিক ক্ষণ মাথামুণ্ড বকিত। তারপর তাহার বাবা স্নান ও পূজা সমাপন করিতে গেলে রান্নাঘরে গিয়া মায়ের উপর নানা রকম উপদ্রব আরম্ভ করিত। অত অল্প বয়সেও তাহার দুষ্টামি বড় কম ছিল না। মায়ের পিঠের উপর ঠেস্ দিয়া "মা, ওটা কি?" "আমি রাঁধ্‌বো", "কোলে নে না" প্রভৃতি সামান্য সামান্য আবদারের ত অন্তই ছিল না; আবার মাঝে মাঝে নুনের বাটি উপুড় করিয়া, জলের ঘটি ফেলিয়া দিয়া, একাকার করিত। নীরদাসুন্দরী যত বারণ করিতেন "ওটা ছুঁস্‌নি"

"পড়ে যাবে" ফেলিস্ নি" ততই মেয়ে আধ-আধ স্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিত, "না পড়ে যাবে না।" বলিতে না বলিতেই যখন ঘটি বাটি উপুড় হইয়া যাইত, তখন মাতার প্রহার হইতে তাহার রক্ষা পাওয়া কঠিন হইত। তখন অভিমানিনী উচ্চ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিত। হরনাথবাবু আসিয়া কোলে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও সে নীরদাসুন্দরীর আঁচল জড়াইয়া থাকিত। মায়ের নিকট মার খাইলেও মাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিত না।

একদিন রাত্রিতে বারুণী কিছুতেই ঘুমাইতেছিল না। কেবল পাশ ফিরিতেছিল ও অসন্তোষব্যঞ্জক অস্ফুষ্টধ্বনি করিতে-ছিল। হরনাথবাবু সেদিন সদর হইতে অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্য নীরদাসুন্দরী বারুণীকে ঘুম পাড়াইবার জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মাথা চাপড়াইয়া আদর করিয়া কিছুতেই তাহাকে স্থির হইয়া শয়ন করাইতে পারিলেন না। ক্রমশঃই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রথমটা ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার জন্য দু' একবার চেষ্টা করিয়া শেষে ক্রোধে বারুণীর পিঠে এক চড় মারিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। বারুণী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরনাথবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বলিলেন, "চুপ্ কর্ খুকী, চুপ্ কর্। কাঁদ্তে আছে কি ?"

এই কথায় থামা দূরে থাকুক বারুণী আরও উচ্চৈঃস্বরে "মা, মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীরদাসুন্দরী বারুণীকে ঠেলিয়া দিয়া তাহার দিকে পিছন করিয়া শুইয়াছিলেন ;

বারুণীর চীৎকারে কর্ণপাত করিলেন না। হরনাথবাবু একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "কি হ'ল কি? এত রাত্তিরে কান্না কেন?"

নীরদাসুন্দরী সক্রোধে বারুণীকে বলিলেন, "চুপ্ কর্ বল্ছি। নইলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।"

হরনাথবাবু বলিলেন, "ভুলিয়ে নাও না। অনন ধমক দিলে কখনও ছেলে পুলে ঠাণ্ডা হয়?"

নী। আমি আর পারি না বাপু। মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়? সমস্ত দিন এই খাটুনি, দিনের বেলাতে ত জ্বালাতনের অন্ত নাই। তার উপর রাত্রিতে একটু ঘুমোব তারও উপায় নাই। এমন করলে কি মানুষে পারে? যত, বড় হচ্ছে ততই মেয়ের দুষ্টুমি বাড়্ছে। খাওয়া দাওয়া হ'ল, রাত্তিরটা চুপ্ করে ঘুমো; তা নয়, খালি খুঁৎ খুঁৎ কান্না। চুপ্ কর্লি? এখনও চুপ্ কর্লিনি?

এই বলিয়া নীরদাসুন্দরী আবার বারুণীর পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিলেন। বারুণী তাঁহাতে আরও উচ্চরবে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

হরনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "ও কি তোমার স্বভাব? ছেলে পুলের গায়ে হাত তুল্তে আছে? ওর কি কিছু জ্ঞান আছে? মার ধ'র কর্লে কি হবে?"

নীরদাসুন্দরীরও অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল। রাগের সময় তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। বলিলেন, "আমার দ্বারা সে সকল হবে না। আদর দিতে হয় তোমার মেয়েকে তুমি আদর দাওগে যাও।"

হরনাথবাবু নিজের বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়া বারুণীকে তুলিয়া লইতে লইতে বলিলেন, "তাই দেব। আজ থেকে আমিই মেয়েকে মানুষ করব। তোমায় কিছু করতে হবে না।"

নী। করগে যাও। তা'হলে ত আমি বাঁচি। দেখ, খপরদার আমার কাছে কখনও মেয়েকে দিতে পাবে না।

হরনাথবাবু সংক্ষেপে "আচ্ছা" বলিয়া বারুণীকে কোলে লইলেন। তাঁহারও রাগ হইয়া গিয়াছিল। তিনি অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছেলেপুলেকে মার ধর করা মোটেই পছন্দ করিতেন না। নীরদাসুন্দরী সময়ে সময়ে মেয়েকে যে প্রহার করিতেন তাহাতে অনেকদিন হইতেই তিনি অপ্রসন্ন ছিলেন। আজ রাত্রিতে সেই অপ্রসন্নতা তাঁহার বাক্যে প্রকাশ হইয়া গেল।

হরনাথবাবুর সহিত নীরদাসুন্দরীর বেশী কথাবার্ত্তা হইল না বটে, কিন্তু ঐ কথাগুলিই এইরূপ স্বরে ও ভঙ্গীতে হইল যে, ঐ কয়টি কথাতেই তাঁহাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। বিবাহের পর সামান্য সামান্য দুই একটা ঝগড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বিবাদের কোনও স্থায়ী কারণ অবলম্বন করিয়া হয় নাই।

হরনাথবাবু বারুণীকে কোলে করিয়া দোল দিতে দিতে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। ক্রমশঃ বারুণীর রোদনের স্বর মৃদু হইয়া আসিল ও বার কতক ফোঁপাইয়া সে বাপের বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

হরনাথবাবু তাহাকে নিজ শয্যায় শয়ন করাইয়া বলিলেন; "খুকীর গা'টা গরম ঠেক্ছে কেন? জ্বর হয়েছে নাকি?"

"কি জানি? তুমি দেখগে।"

এই বলিয়া নীরদাসুন্দরী পাশ ফিরিয়া শুইলেন বটে, কিন্তু ঐ কথা কয়টি তাঁহার হৃদয়ে এক আশঙ্কা জাগাইয়া দিল। মুখে রাগের মাথায় হরনাথবাবুকে শুনাইয়া নীরদাসুন্দরী কন্যার প্রতি অনাদর দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মাতৃহৃদয় ত উদাসীন নয়। তাই সে রাত্রিতে হরনাথবাবু ও বারুণী বেশ ঘুমাইল বটে, কিন্তু নীরদাসুন্দরীর নিদ্রা হইল না। কেবল ভাবিতে লাগিলেন, "অসুখ হয়েছে বলেই হয়ত মেয়েটা কাঁদ্‌ছিল। রাগের মাথায় মেরে ভাল কাজ করিনি।" তা'র উপর স্বামীর বিরক্তি ও ক্রোধ স্মরণ করিয়া নীরদাসুন্দরী আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন ও সমস্ত রাত্রি বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলেন।

সকালে হরনাথবাবু দেখিলেন বাস্তবিকই বারুণীর অতিশয় জ্বর হইয়াছে। তিনি প্রাতঃকৃত্য সারিয়াই কবিরাজ ডাকিতে গেলেন।

সকাল হইতেই নীরদাসুন্দরী স্বামীর সহিত মনোমালিন্য দূর করিবার ইচ্ছায় আশে পাশে ঘুরিতেছিলেন। হরনাথবাবু যদি একটি কথা বলিতেন তাহা হইলেই নীরদাসুন্দরী কথা কহিতেন, বুঝি বা সকল গোল মিটিয়া যাইত। কিন্তু অসুখের উপরও মেয়েকে মারিয়াছে এই কথা স্মরণ করিয়া তখনও হরনাথবাবুর ক্রোধের উপশম হয় নাই। তাই নীরদাসুন্দরী যখন নিত্য নিয়মিত গাড়ু গামছা আনিয়া দিলেন তখন হইতে বিবিধ ছলে যদিও তিনি আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলেন তবুও হরনাথবাবু একটিও কথা কহিলেন না। প্রথমে নিজেই

কথা কহিয়া ক্ষমা চাহিবেন নীরদাসুন্দরীর সে প্রকৃতিই ছিল না। তাই ক্ষণিক অসন্তোষ দূর করিয়া মিলনে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

নীরদাসুন্দরীর আরও কষ্ট হইল বারুণীর জন্য। যে মেয়ে ভোরবেলায় উঠিয়া কলহাস্য, চীৎকার ও গানের দুই এক পংক্তি উচ্চারণ করিত, কত মাথামুণ্ড বকিত, আজ তাহার সাড়াশব্দ নাই। ঘোর জ্বরে অভিভূতপ্রায় হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছে। নীরদাসুন্দরীর ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া যাইয়া একবার বারুণীকে বুকে ধরেন। কিন্তু হরনাথবাবুর সহিত পূর্ব্ব রাত্রিতে যেরূপ কথা হইয়াছে তাহাতে এ কার্য্য করিতে তিনি সাহস পাইতেছিলেন্ না। কেবল আশে পাশে অন্য ছলে ঘুরিয়া স্বামীর অগোচরে কন্যার রোগক্লিষ্ট মুখখানির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন। হরনাথবাবু কবিরাজ ডাকিতে বাহির হইয়া যাইবামাত্রই নীরদাসুন্দরী ছুটিয়া গিয়া বারুণীর শয্যার উপর পড়িলেন ও তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাদু আমার! মাণিক আমার! অসুখ করেছে? আমি মেরেছি বলে রাগ করেছ? আমি কি তোমাকে ভালবাসি না?" বারুণী মাতার আদরে রোগতপ্ত মস্তকখানি মাতার বুকে রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পর হইতে নীরদাসুন্দরীর জীবনের মহাপরীক্ষা আরম্ভ হইল। হরনাথবাবু যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, যতক্ষণ বারুণীর কাছে থাকেন, বারুণীকে ঔষধ খাওয়ান, ততক্ষণ কন্যাকে বুকে ধরিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ফাটিয়া গেলেও নীরদাসুন্দরী দূরে দূরে সরিয়া থাকেন। স্বামী সরিয়া

গেলেই তিনি একেবারে বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার মাতৃস্নেহক্ষুধা মিটাইবার জন্য রুগ্না কন্যাকে বারবার বুকে চাপিয়া ধরেন।

হরনাথবাবু যদি এ সময় একটু মনোযোগ করিতেন, তাহা হইলেই মাতৃহৃদয়ের এ ব্যাকুলতা সহজেই ধরিতে পারিতেন। কিন্তু নীরদাসুন্দরী তাঁহার সম্মুখে রুগ্না বারুণীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন বলিয়া হরনাথবাবুর বিশ্বাস হইয়াছিল যে কন্যার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও স্নেহমমতা নাই। থাকিলে রুগ্না কন্যাকে এরূপে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। এই বিশ্বাসে হরনাথবাবু নীরদাসুন্দরীর উপর আরও বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তাঁহার সহিত বাক্যালাপও বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন না যে নীরদাসুন্দরী তখন চারক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রসাদপুর গ্রামের জাগ্রত দেবতা "বাবাঠাকুরে"র উদ্দেশে মানসিক করিতেছিলেন—বারুণী ভাল হইলে বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন।

নীরদাসুন্দরীর প্রাণের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বারুণী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। তাহার রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ শুষ্ক বদনখানিতে মাঝে মাঝে ম্লান হাস্য দেখা দিতে লাগিল। হরনাথবাবু চাকরির মায়া উপেক্ষা করিয়া কন্যার সেবায় রত হইয়াছিলেন। বারুণী আরোগ্যলাভ করিতেছে দেখিয়া তিনি আবার নিজ কার্য্যে মন দিলেন। নীরদাসুন্দরীর তখন মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। রাতদিন বারুণীকে বুকে করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

অসুখের পর বারুণীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

সাধারণতঃ রোগে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বারুণী নানা প্রকার আবদার করিতে থাকিত। কিন্তু এবার আর তাহার কোনও আবদার অপূর্ণ থাকিত না। নীরদাসুন্দরী যথাসাধ্য তাহার মনের অভিলাষ পূরণ করিতেন। তাহার ফলে বারুণী এখন যাহা চাহিত তাহাই পাইত। চিরাভ্যস্ত মাতার তিরস্কার অন্তর্হিত হওয়াতে বারুণীও আজকাল আবদারের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বারুণী একটু সবল হইলে নীরদাসুন্দরী মানসিক পূজা দিবার জন্য প্রসাদপুর গ্রামে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে প্রসাদপুরে বার্ষিক মেলা বসিয়াছে। বহুদূর হইতে লোক আসিতেছে। কত দোকানদার কত প্রকার দ্রব্য খেলনা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। নীরদাসুন্দরীর গ্রামের অনেক রমণী মেলা দেখিবার জন্য যাত্রা করিবে। নীরদাসুন্দরীও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া পূজা দিয়া আসিবেন স্থির করিলেন।

হরনাথবাবুকে এ কথা কিছু না বলিয়া একদিন সকাল সকাল তিনি সদরের কাছারীতে মোকর্দ্দমা তদ্বিরের জন্য বাহির হইয়া গেলে নীরদাসুন্দরী বারুণীকে খাওয়াইয়া গ্রামের পচার মা নামক বৃদ্ধার তত্ত্বাবধানে তাহাকে রাখিয়া প্রসাদপুর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু মাতাকে ভাল কাপড় পরিতে দেখিয়াই বারুণী "মা, কোথা যাবে? আমি যাব" বলিয়া মহা আবদার আরম্ভ করিয়া দিল। বিশেষ যখন গরুর গাড়ী-খানি আসিয়া দরজায় লাগিল তখন বারুণীকে ভুলাইয়া রাখা মহা মুস্কিল হইয়া পড়িল। নীরদাসুন্দরী বহু প্রকারের খেলনা

প্রভৃতি দিয়া বারুণীকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। বারুণী সে সকল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

নীরদাসুন্দরী তখন তাহাকে কোলে লইয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পুরুষানুক্রম হইতে সযত্নে রক্ষিত একটি কড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছিল। সেই লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি বহু পূর্ব্বকাল হইতে হরনাথ বাবুর সংসারে স্থাপিত হইয়াছিল। এ পরিবারে একটা প্রবাদ শোনা যাইত যে, যতদিন এ ঝাঁপি তাঁহাদের গৃহে থাকিবে ততদিন তাঁহাদের কোনও অর্থাভাব ঘটিবে না। সুখেই হউক দুঃখেই হউক তাঁহাদের দিন এক প্রকারে চলিয়া যাইত বলিয়া এ প্রবাদে তাঁহারা সকলেই বিশ্বাস করিতেন। লক্ষ্মীপূজার দিন ঐ ঝাঁপিটির পূজা হইবার সময় বারুণী উহা লইবার জন্য মহা অনর্থ বাধাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মাতার নিকট প্রহার ভিন্ন সে তখন আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। সর্ব্বস্ব গেলেও লক্ষ্মীর কৌটা কেহ ছাড়িতে চাহে না। শুনা যায় গ্রামের জমীদারের গৃহে ডাকাতি হইয়া যখন সর্ব্বস্ব অপহৃত হয় তখন লক্ষ্মীর কৌটাটি ডাকাতেরা লইয়া যায় নাই। ঐ লক্ষ্মীর কৌটার বলে আবার জমীদারেরা লুণ্ঠিত সম্পত্তির চতুর্গুণ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আজ আবার সেই লক্ষ্মীর ঝাঁপিটির উপর বারুণীর দৃষ্টি পড়িল। সে আজ আবার ঝাঁপিটি পাইবার জন্য "মা, ঐটে নেব।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাহির হইতে গাড়োয়ান ও পল্লীরমণীগণও নীরদাসুন্দরীকে শীঘ্র রওনা হইবার জন্য তাগাদা করিতেছিল। নীরদাসুন্দরী তখন বারুণীকে ভুলাই-

বার আর কিছু উপায় না পাইয়া সেই ঝাঁপিটি তাহার হাতে দিয়া ঠাকুরঘরে তাহাকে বসাইয়া দিলেন ও শাসাইয়া বলিলেন, "যদি ভাঙ্গে কি হারায় তা' হ'লে আজ তোমায় খুন করে ফেল্‌ব।" এই প্রকার ভয় দেখাইয়া তাড়াতাড়ি তিনি গরুর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

বহু আশার দ্রব্য ঝাঁপিটি পাইয়া বারুণীর বড় আহ্লাদ হইয়াছিল। সে সমস্ত গৃহে গিয়া ঝাঁপিটি খুলিবার বিবিধ চেষ্টা করিতেছিল। খানিক টানাটানির পর তাহার ডালা খুলিয়া গেল। তখন তাহার ভিতরে হাত পুরিয়া দিয়া ধান, মোহর, সিঁদুরের কৌটা, কড়ি, কাষ্ঠনির্ম্মিত লক্ষ্মীর পেচক প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিল। অস্ফুট স্বরে কত কি বকিতে বকিতে এই জিনিষগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। একবার বাহির করিয়া আবার সেগুলি ভিতরে রাখিল, পরে ঝাঁপিটি উপুড় করিয়া আবার সেগুলি মেঝেয় ঢালিয়া ফেলিল।

পচার মা বাহিরের দালানে আঁচল পাতিয়া শুইয়াছিল। দুই একবার "হরি মধুসূদন" বলিয়া হাই তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইবার আগে বারুণীকে বলিল, "দিদিমণি, কোথাও যেও না। ঐখানে বসে বসে খেলা কর।"

বারুণী উত্তর দিল "আচ্ছা।"

ঝাঁপিটি ও তাহার মধ্যে যে জিনিষগুলি ছিল তাহা নানাপ্রকারে নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে বারুণীর আর স্থিরভাবে সেখানে বসিয়া খেলা করিতে ইচ্ছা হইল না। ঝাঁপিটির মধ্যে জিনিষগুলি তুলিয়া সেটিকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইয়া গেল। পচার মায়ের নাক-

ডাকা তাহার লঘু পদশব্দে বন্ধ হইল না। কতকগুলি ধান ঠাকুরঘরের মেঝেতে পড়িয়াই রহিল। বারুণী আর সেগুলি খুঁটিয়া তুলিতে পারে নাই।

বারুণী খিড়কীর পুষ্করিণীর দিকে ঝাঁপিটি লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া ঝাঁপিটি নামাইল। পাশে একটা আমগাছ ছিল। তাহাতে বসিয়া একটা কোকিল ডাকিতেছিল। বারুণীও দুই একবার তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া ডাকিল "কু—উ।"

তাহার পর সেখান হইতে কতকগুলি ইট পাটকেল কুড়াইয়া ঝুড়ির মধ্যে রাখিল ও আপন মনে খেলা করিতে লাগিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পল্লীগ্রামখানি নিস্তব্ধ। অনেকেই সেদিন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া মেলা দেখিতে গিয়াছে।

খেলা করিতে করিতে একবার যখন বারুণী ঝাঁপিটিকে উপুড় করিয়া ধরিয়া নাড়া দিতে গেল তখন ঝাঁপিটি তাহার হাত হইতে ফস্‌কাইয়া পুষ্করিণীর অসমতল পাড়ের উপর গড়াইতে গড়াইতে জলের সীমানায় গিয়া লাগিল। বারুণীর প্রথমটা ভয় হইয়াছিল। একবার "ঐ—যাঃ" বলিয়াও উঠিয়াছিল। পরে দেখিল ঐ ত পড়িয়া রহিয়াছে। মনে মনে স্থির করিল "এই বেলা কুড়াইয়া আনি। নহিলে মা বকিবে।"

এই সংকল্প করিয়া বারুণী পুষ্করিণীর পাড় দিয়া নামিবার চেষ্টা করিল। উঁচু নীচু মাটি। বুকে হাঁটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া বারুণী নামিতে লাগিল। খানিকটা নামিতেই এক

জায়গায় নরম মাটি তাহার পায়ের চাপে ধসিয়া গেল। সেও সামলাইতে না পারিয়া উচ্চ পাড় হইতে পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া গেল।

*　　*　　*　　*

নীরদাসুন্দরী প্রসাদপুরে "বাবা ঠাকুরের" মন্দিরে বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত হইলে বারুণীর জন্য ঠাকুরের ফুল সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া পল্লীর রমণীগণের সহিত মেলা দেখিতে বাহির হইলেন। খেলানার দোকানে গিয়া বারুণীর জন্য কিছু সন্দেশ গোটাকতক পুতুল ও একটা বাঁশী কিনিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য গরুর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

গাড়ীখানি বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে যখন হরনাথ বাবুর খিড়কির পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ পথে উপস্থিত হইল তখন পুষ্করিণীর চারিদিক লোকে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে লালপাগড়ীবাঁধা চৌকীদারও ছিল। হরনাথবাবু আমগাছের তলায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি নীরদাসুন্দরীর গাড়ী দেখিতে পাইল না। তাঁহার পদতলে বারুণীর দেহ পড়িয়া ছিল।

লজ্জার বাধা না মানিয়া নীরদাসুন্দরী যখন বারুণীর দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন তখন হরনাথ বাবুর যেন চমক্ ভাঙ্গিল। তখনও নীরদাসুন্দরীর আঁচলে বারুণীর জন্ত আনীত দেবতার নির্ম্মাল্য। বাঁশী ও পুতুলগুলি সেইখানে ছড়াইয়া পড়িল।

হরনাথবাবু স্তব্ধভাবে সেই বাঁশী ও পুতুলগুলির দিকে

চাহিয়া রহিলেন। নীরদাসুন্দরীর মাতৃহৃদয় আজ সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

পাড়ার রাইচরণ হরনাথের হাত ধরিয়া বলিল, "মুখুয্যে মশাই, বাড়ীর ভিতর যান। মাঠাকুরুণকে নিয়ে যান। আমরা অন্য ব্যবস্থা কচ্ছি।"

হরনাথবাবু উঠিলেন। দুই তিনজনেও নীরদাসুন্দরীর বুক হইতে বারুণীকে ছিনাইয়া লইতে পারিল না দেখিলেন। লাজ লজ্জা না মানিয়া নীরদাসুন্দরী যে উচ্চ বিলাপধ্বনি করিতেছিলেন তাহা শুনিলেন। নীরদাসুন্দরীকে তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিলেন। অবশেষে বাড়ীর ভিতর যখন জোর করিয়া নীরদাসুন্দরীকে আনা হইল, তখন তিনি বারুণীর ছোট কাঁথা ও বালিশসজ্জিত বিছনাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন হরনাথবাবু আর থাকিতে পারিলেন না। নীরদাসুন্দরীর মাথায় হাত দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন "নীরু!"

নীরদাসুন্দরী অনেক দিন এ আদরের ডাক শুনেন নাই। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। উভয়ের নয়নের জলে এতদিনের সঞ্চিত সকল মনোমালিন্য সকল বিবাদ ধৌত হইয়া গেল।

আমার চাকরি

মামার অনেক খোসামদ করিয়া একটি চাকরি পাইলাম। কটকে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। হাজার হাজার লোক মরিতেছে। সরকার হইতে তাই চাউল বিতরণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আমার উপর সমস্ত জিনিস পত্রের ভার থাকিবে।

বাড়ীতে চাকরি হওয়ার সংবাদ দিতে সকলেই উৎফুল্ল হইল। মা দেবীর পূজায় বন্দোবস্তে মন দিলেন। পরিবার নূতন গহনা পরিবেন এই কল্পনায় মত্ত হইলেন। ছোট ভাই বলিল, "দাদা, পুরী বেশ যায়গা। আপনি যান, কিছুদিন পরে আমিও একবার হাওয়া বদলাইয়া আসিব।" প্রতিবেশীরা বলিল, "বিমল, খাইয়ে দাও হে। চাকরি হ'লে ত খাওয়াবার কথা ছিল।" আনন্দে সকলকেই যথোচিত সম্ভাষণ করিলাম।

অবশেষে যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাঙ্গালী ঘর ছাড়িতে বড়ই নারাজ। একটি ষ্টীলট্রাঙ্কে সহধর্ম্মিণী বহু যত্নে খানকতক কাপড় ও দু' চারিটি জামা বার বার নানা রকমে সাজাইতে লাগিলেন। আমাদের মত লোকের আর আসবাবই বা কি? একখানা থালা একটা গেলাস হইলেই চলে। মাহিনা ত ২৫৲ টাকা। তা বলিলে কি হয়? প্রথম চাকরি পাইয়াছি। ঐ টাকাতেই কত কি করিব তাহার বন্দোবস্ত মনে মনে করিতে লাগিলাম। অন্নকষ্ট ত ঘুচিলই— হাতে কিছু টাকা জমিবে, পরিবারের অলঙ্কার হইবে,

ভাইটির লেখাপড়ার খরচ চলিবে, ইত্যাদি কল্পনায় বেশ সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ চলিতে লাগিল! সবে তখন একুশ বছরে পড়িয়াছি কি না!

যথা সময়ে 'দুর্গা' বলিয়া যাত্রা করা গেল। মায়ের আশীর্ব্বাদ-বাণী, সহধর্ম্মিণীর কাতর মুখখানি তখনও মনে জাগিতেছিল। ভ্রাতা সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে আসিলে তাহাকে বলিলাম, "সাবধানে থেকো। কিছু বিপদ্ আপদ্ হলে টেলিগ্রাম করো। চলে আস্‌বো।" গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

বাঙ্গালীর ঘরের প্রতি টান যে কতদূর তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সাহেবেরা নিশ্চিন্তমনে চুরুট টানিতে টানিতে গাড়ীতে বসিয়া খবরের কাগজ্ পড়িতেছে। কিন্তু আমার অত্যন্ত চিন্তা। নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছি। অপরিচিত দেশ, অপরিচিত অধিবাসী। সেখানে আপনার বলিতে কেহ নাই। বাড়ীর কথা মনে পড়িল। এতক্ষণে আমার ভাই হয়ত বাড়ীতে ফিরিয়াছে। আজ সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। আমার সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি আজ শূন্য। আমি চলিয়াছি কোথায়? যথায় নিয়মিত সময়ে মায়ের স্বহস্তে প্রস্তুত অন্ন আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না, সহধর্ম্মিণীর শত ক্ষুদ্র সেবার অভাব প্রতিপদে পরিলক্ষিত হইবে, ভ্রাতার অসীম অনুরাগ ও আনুগত্য শত ভাষায় ফুটিয়া উঠিবে না,—তথায়।

কিন্তু চিন্তার স্রোত দেহের কাতরতাকে রোধ করিতে পারে না। তাই বহুক্ষণ পরে তন্দ্রাতুর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়া দেখি আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীও একজন বাঙ্গালী। তাঁহার অধীনে আমাকে মালপত্র হিসাবমত রাখিতে হইবে। দৈনিক যাহা বিতরণ হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। কাজ এমন বিশেষ কিছু নয়।

অনেক জিনিস রহিয়াছে। যাহারা অনেকদিন খাইতে পায় নাই তাহারা একেবারে ভাত খাইলে মারা যাইবে—এই জন্য দুধের বন্দোবস্ত। বিলাতী ব্যবসাদারগণের কৃপায় গাঢ় দুধের অভাব নাই। এইরূপ গাঢ় দুধের বহু কৌটা সঞ্চিত ছিল। এতদ্ব্যতীত স্তূপাকারে চাউলের বস্তা ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদিও সংগৃহীত।

আমি তখনও পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর মূর্ত্তি দেখি নাই। চাঁদা উঠিত তাহাই দেখিতাম। বুঝিতাম অনাহারে অনেকে হাহাকার করিতেছে। কিন্তু চক্ষের সম্মুখে কোনও ছবি ফুটিয়া উঠিত না।

আজ সকালে বিতরণের পূর্ব্ব হইতে আমাদের ঘরের সম্মুখস্থ মাঠে লোক জমিতেছিল। শুনিলাম মধ্যরাত্রি হইতে এইরূপ লোক আসিতেছে। আমি তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলাম। সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি—অতি শোকাবহ দৃশ্য। শত শত ক্ষীণ কঙ্কালসার নরনারী ও বালক বালিকা। অনেকে চলচ্ছক্তিরহিত, প্রাণপণ চেষ্টায় গৃহ-সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিলাম এক রমণী এক দিকে মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া হাঁপাইতেছে। তাহার পার্শ্বে একটি সাত আট বৎসরের ছেলে বসিয়া শূন্যনেত্রে চাহিয়া

আছে। শুনিলাম নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে জলরাশি শত শত গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই এত লোক আজ সর্ব্বস্বান্ত!

এই করুণ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া গৃহে প্রাবশ করিলাম। আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হলধরবাবু তখন প্রাতর্ভোজনে রত। ষ্টোভের উপর কেট্‌লি হইতে ধূম উঠিতেছে। সুগন্ধি চা, পেয়ালা, চামচ কিছুরই অভাব নাই। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর জন্য প্রেরিত গাঢ় দুগ্ধের কৌটা খোলা হইয়াছে। হলধর বাবুর চায়ে তাহা ব্যবহৃত হইবে।

হলধরবাবু সহাস্যে বলিলেন, "এই যে বিমল বাবু, আসুন, এক পেয়ালা চা খান্।" সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশিকে হুকুম হইল "বুদ্ধু, বাবুর একটা পেয়ালা বাহির কর।"

আমার সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত তীব্রবেগে বহিতে লাগিল। বাহিরে অনশনক্লিষ্ট নরনারী পূর্ব্বদিন রাত্রি বারটা হইতে তৃষিত নয়নে গৃহদ্বারে চাহিয়া আছে,—কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ মৃতপ্রায়; আর গৃহাভ্যন্তরে তাহাদের খাদ্য দুগ্ধে সুরভি চা প্রস্তুত করিয়া হলধরবাবু নিরুদ্বেগে সহাস্যমুখে বলিতেছেন "বিমলবাবু, এক পেয়ালা চা খান!" আমার মাথা গোলমাল হইয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে হলধরবাবুকে কি বলিলাম তাহা মনে নাই, কিন্তু উত্তরে হলধরবাবু যে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে। শুনিলাম, "এখনও আপনি ছেলে মানুষ। আমি বিশ বছর এই রিলিফ ওয়ার্কসের কাজ চালিয়ে আসছি; আমার কথা শুনুন। আপনি যে রকম ভাব দেখাচ্ছেন, তা কবিতায় শোভা পায়। সংসারে ওরকম কথা

চলে না। আপনি যদি নিজে কিছু না খেয়ে শুকিয়ে মরেন, তাহলে এদের সাহায্য হবে কি?"

আমি ভাবিলাম "তা হতে পারে। কিন্তু তবু—তবু এ রকম হৃদয়হীনতা—এ রকম ঔদাসীন্য—"

রাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। একজন চাপরাসী আসিয়া বলিল, "রেয়ৎ সব ঠেলাঠেলি কচ্ছে।" হলধরবাবু চা চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "হাঁ। পুলিশের সাহায্য চাই। বুদ্ধু, তুমি থানায় যাও; বল দশজন চৌকিদার চাই, নইলে আমাদের ঘর লুটে নেবে।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "বলেন কি মশায়? এরা নিজেরা দাঁড়াতে পারে না—এরা আবার লুট করবে! একে ত না খেয়ে মরছে, আবার কেন পুলিশের অত্যাচার বাড়াচ্ছেন?"

হলধরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিমলবাবু, আপনার বড় কোমল হৃদয়। আমার কথা শুনুন, ও রকম করলে কাজ চালাতে পারবেন না। নিজের ভাবনা ভাবুন। দুপয়সা রোজগারের চেষ্টাতেই ত' বিদেশে এসেছি। অন্নসত্র খুলতে ত' আর আসিনি। যাতে দুপয়সা হয় তারই যোগাড় দেখুন। বুদ্ধু, যাও—শীগ্‌গির থানায় যাও।" বুদ্ধু চলিয়া গেল।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বুদ্ধু ফিরিল না। হলধর বাবু হুকুম দিলেন—"পুলিস না আসিলে চাউল বিতরণ হইবে না।" বাহিরে জনতা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। অনাহারে শীর্ণ দুর্ব্বলদেহ নরনারী তখন ক্ষীণ বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে কি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! মনুষ্যকণ্ঠে সেরূপ স্বর কখনও শুনি নাই। হলধরবাবু বাহিরে গিয়া বিকট গর্জ্জনে বলিলেন "চুপ্ রও। চিল্লাওগে ত' এক মুঠাভি চাউল নেহি মিলেগা।"

জনতা নীরব হইল বটে, কিন্তু সে কি দৃশ্য! কেহ অবসন্ন কলেবরে ভূমিতে পতিত র'হিয়াছে, কেহ উদর দেখাইয়া ক্ষুধা জানাইতেছে,—কথা বলিবার শক্তি নাই। সন্তানের পার্শ্বে জননী উদাসীনভাবে বসিয়া আছে। সন্তান কাঁদিতেছে—সে দিকে মনোযোগ নাই। কেহ রৌদ্রতাপে পীড়িত হইয়া গাছের ছায়ায় বসিয়াছে। সেখানে বসিবার জন্য অনেকেই ঠেলাঠেলি করিতেছে।

পশ্চাদ্দিক হইতে একটা গোল উঠিল। ব্যাপার কি কিছুক্ষণ বুঝা গেল না। পরে দেখা গেল বেত্রহস্তে জমাদার ও তৎপশ্চাৎ চৌকিদারের দল সদর্পে আসিতেছে। বলপূর্ব্বক ধাক্কা দিয়া জনতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে হলধর বাবু চাউল বিতরণের হুকুম দিলেন।

চাপরাসীরা চাউল দিতে লাগিল। চৌকিদারগণ জনতাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল। আসন্ন ভোজনের প্রত্যাশায় মুমূর্ষু অনাথের প্রাণেও শক্তিসঞ্চার হইল। যে পড়িয়া ছিল সেও উঠিল। বৃদ্ধ, বালক, যুবক, রমণী, শিশু সকলেরই মুখে একটা অস্ফুট ধ্বনি।

কিন্তু হলধরবাবুর উপদেশমত চাপরাসীরা যে পরিমাণ চাউল প্রত্যেককে দিতেছিল তাহাতে কাহারও উদর-পূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। সরকার হইতে প্রত্যেককে যে পরিমাণ চাউল

দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকও হইবে না। প্রথমে উদরপূর্ণ করিয়া আহারে অনিষ্টের সম্ভাবনা তাই সরকার হইতে অল্প করিয়া বিতরণের আদেশ ছিল। এক্ষণে হলধরবাবু তাহারও অর্দ্ধেক বিতরণের হুকুম দিলেন। আমি একবার বলিলাম, "আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। এত পরিমাণ চাউল দিবার হুকুম আছে।" তিনি বলিলেন, "আমি কি বেশী খাইয়ে মেরে ফেল্‌ব নাকি?"

বিতরণের পর জনতা তাড়াইবার আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। অনেকে সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরেই থাকিতে চায়। হলধরবাবু তাহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। এখানে অত লোক থাকিলে স্থান অপরিষ্কার হইবে। রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। কাজেই দণ্ডচালনায় পুলিশ লোক তাড়াইতে লাগিল।

কিন্তু সে খাদ্যে তাহাদের কি হইবে? লোভ বাড়িবে, উদর ভরিবে না। নরকে বুভুক্ষুর সম্মুখে খাদ্য রাখিয়া প্রলোভন দেখান হয় শুনিয়াছিলাম—ইহাও সেইরূপ! অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

প্রায় বেলা দুইটার সময় একজন স্থূলকায় উড়িষ্যাবাসী হলধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হলধরবাবু তাহাকে বলিলেন, "কেমন, আপনি ঐ দর দিতেই রাজি ত?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু দেখুন, গাড়ী খরচ করিয়া লইয়া যাইতে আমার অনেক টাকা পড়িবে। কি আর লাভ থাকিবে বলুন?"

হলধরবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "লাভ থাকিবে না? বলেন কি? মণকরা বোধ হয় দু'টাকা আপনার থাকিবে।

আমি কি চাউলের দরের সন্ধান রাখি না। যে অকাল পড়েছে—এতেও যদি চাল বেচে লাভ না থাকে তবে কখন আর থাকবে বলুন?" তারপর চুপিচুপি বলিলেন, "এই বাবুটিকেও কিছু দিতে হবে।"

আমি বুঝিলাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া কথাটা বলা হইল। ব্যাপার কিছু বুঝিলাম না। উড়িষ্যাবাসী বলিলেন, "আমি আর এক পয়সাও দিতে পারিব না। আপনি ইঁহাকে যাহা হয় দিবেন।" হলধরবাবু তখন আমার কাণে কাণে কতকগুলি কথা বলিলেন।

কথাটা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সরকারী চাউল যাহা দুর্ভিক্ষে বিতরণ জন্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন! তাই সকালে অত অল্প চাউল বিতরিত হইয়াছে। আমাকে খাতায় লিখিতে হইবে যথোপযুক্ত চাউল বিতরিত হইয়াছে। তাই আমাকেও কোন অংশ না দিলে চলে না।

এ কি চাকরি! মুমূর্ষুর শেষ গ্রাস কাড়িয়া অর্থোপার্জ্জন! আমি বলিলাম, "আমি কিছু চাহি না। আমা দ্বারা এ কাজ হবে না।" আমি বাহিরে চলিয়া গেলাম।

কিছুদূর গিয়া দেখি এক বৃক্ষমূলে এক রমণী উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পার্শ্বে এক বালক। দেখিয়াই চিনিলাম। সকালে মাঠে যাহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়াছিলাম এই সেই। বালকটি কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "তোমরা খাও নাই?" বালক বলিল, "রাঁধিব কিরূপে? চাল যেমন পাইয়াছি তেমনি রহিয়াছে।

কিছু কাঁচা চিবাইয়া খাইয়াছি মাত্র।" আমি তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া বলিলাম, "বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আন।"

বালক বলিল, "আপনি অনুগ্রহ করে একটু এখানে দাঁড়ান। মা ভির্ম্মি গিয়েছে। খাবার এনে খাওয়াব।" আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। বালক চলিয়া গেল।

রমণী মৃতবৎ পড়িয়া ছিল। অনাহারে ক্ষীণ কঙ্কালসার দেহ কোন মতে প্রাণটুকু ধরিয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ কেশরাজি মলিন ও জটাকার। বস্ত্রও শতছিন্ন। মধ্যে মধ্যে এক একটা নিশ্বাস তাহার সর্ব্বদেহ কাঁপাইয়া বাহির হইতেছে। মনে হইতেছে যেন এই পরিশ্রমেই তাহার মৃত্যু হইবে।

আমি দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম—একদিন হয়ত এ রমণী গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত ছিল। কাল বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় আজ ইহার এই দশা। মানুষ মানুষের জন্য কেন যে অনুভব করে না তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। একদিন ছিল যখন অন্যান্য ধনিদের মত আমিও সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষকাহিনী পড়িয়া একটু চিন্তার স্বরে বলিতাম "ওঃ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে!" ঐ পর্য্যন্ত। এ সংবাদে প্রাণ কাঁদিত না। বিপন্নের সাহায্যার্থ ছুটিবার জন্য আগ্রহ হইত না। আজ একদিনে আমার চিত্তের কি পরিবর্ত্তন! যতদিন এ দেহে জীবন থাকিবে কোথাও দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। সুভোজ্য সম্মুখে রাখিয়া যখন বসিব তখন এই অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর মূর্ত্তি নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। পত্নীপুত্রকে যখন সাদর সম্ভাষণ করিব তখন উন্মুক্ত অম্বরতলে তৃণশয়নে পতিত অনাহার-মৃত রমণী ও শিশুদের মনে পড়িবে।

ভগবান্! ধনিদের ঐশ্বর্য্যের এক এক কণা দান করিলে এ দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়, কেন তাহাদের হৃদয়ে সে করুণার স্থান নাই?

বালক ফিরিয়া আসিল। মৃত্তিকাভাণ্ডে জল ও বস্ত্রের প্রান্তদেশে খাদ্য বাঁধিয়া আনিয়াছে। জলসেকে বহুযত্নে জননীর চৈতন্য সম্পাদন করিল। তাহার পর খাইতে দিল। রমণী কথা কহিল না। সাগ্রহে খাইতে লাগিল। আমি চলিয়া আসিলাম।

হলধরবাবু সেদিন আমার সহিত কোন কথা কহিলেন না। ভাবে বুঝিলাম তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমিও নীরব রহিলাম।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ভাত খাইয়া কলাপাত নিজেই বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। দেখিলাম একটি ছায়ামূর্ত্তি অন্ধকারে আসিয়া পাতটি তুলিয়া লইল। আমি একটু দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আমার উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত যে দুই একটি অন্নকণা ছিল সে তাহা সাগ্রহে খাইতেছে। আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিলাম "কে?" মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিলাম সেই বালক। সে বলিল "বাবুজি আমি।" সে বলিল, "বাবুজি, মা তিন দিন খায় নাই। যা কিনেছিলুম, মা-ই খেয়েছে।" আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিলাম "দাঁড়া।" গৃহমধ্যে খাহা কিছু আছে আনিয়া দিলাম। বালক খাইতে লাগিল।

এই সময় একজন চৌকিদার সেখানে আসিল। বলিল "বাবু, করছেন কি? খবর পেলে এখনি হাজার কাঙ্গালী

জুটবে। আপনি ক'জনকে খাওয়াবেন। এই দেখুন—এই, হট্ হট্—

সত্যই এক দীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া বালকের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে লাগিল। বালক নীরবে বসিয়া রহিল। চৌকিদার দ্রুতপদে গিয়া, আমি নিবারণ করিবার পূর্ব্বেই, তাহাকে এক ধাক্কা দিল। সে ধাক্কার বেগ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিয়া সে ভূপতিত হইল।

বালক কাঁদিয়া উঠিল। "বাবুজি, আমার মাকে মেরে ফেল্লে।" আমার শোণিতপ্রবাহ স্থির হইয়া গেল। এ কি দেখিলাম! মাতা পুত্রের খাদ্য কাড়িয়া খাইতেছে!

অগ্রসর হইয়া রমণীকে, তুলিলাম। তাহার দেহ স্পন্দহীন! ছাড়িয়া দিতেই লুটাইয়া পড়িয়া গেল। মৃত্যু তাহাকে আশ্রয়-দান করিয়াছে। তাহার সকল যন্ত্রণা ফুরাইয়াছে!

কাতরকণ্ঠে বালক কাঁদিয়া ডাকিল "মা—মা—"!

তাহার পরদিনই চাকরি ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

অনাদৃত

গোপীমোহন পাড়ার সকলেরই পরিচিত ছিল। তাহার কেমন একটা আকর্ষণ ছিল যে, সে কোন বাড়ীতে আসিলেই সকলে তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িত। ছেলেরা কোলে কাঁধে চড়িবার চেষ্টা করিত, এবং "গল্প বল" গল্প বল" বলিয়া তাহাকে অস্থির করিত। যুবকেরা রঙ্গ-রহস্য করিত। বৃদ্ধেরাও সহাস্যে স্নেহপূর্ণ চক্ষে তাহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত।

গোপীমোহন বড় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার জীবনটা একভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। পিতা সওদাগরের আফিসে কাজ করিত। সারাজীবন কেরাণীর কলম চালাইয়া যেদিন বৃদ্ধ ইহলোক পরিত্যাগ করিল তাহার পর হইতে গোপীমোহনই সংসার চালাইতে লাগিল। আর সংসারই বা কি? বাড়ীতে কেবল বৃদ্ধা মাতা।

সাহেবকে অনেক করিয়া ধরিয়া গোপীমোহন পিতার চাকরিটি যোগাড় করিয়াছিল। মাহিনা কুড়ি টাকা। পিতার রোগশয্যায় ডাক্তার ও ঔষধখরচ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে গোপীমোহনের কিছু ধার হইয়াছিল। কুড়িটি টাকা হইতে মাসে মাসে কিছু বাঁচাইয়া সে ধার শোধ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সংসার খরচ চালাইয়া কত টাকাই বা সে বাঁচাইবে? তাই সুদ নিয়মিত ভাবে দিতে পারিলেও আসলের কিছুই এ পর্য্যন্ত সে পরিশোধ করিতে পারে নাই।

মা বলিত, "দেখ্ গুপি! বুড়ো হয়ে পড়্‌লুম। একটা বিয়ে কর। নাতিপুতির মুখ দেখে গঙ্গালাভ করি। একলা আর থাকতে পারি না।" গোপীমোহন বুঝাইত, "এই যে আগে দেনাটা শোধ করি।"

গোপীমোহন ছেলেপুলে বড় ভালবাসিত। তার কোমল স্নেহময় অন্তঃকরণ স্নেহ করিবার পদার্থের সন্ধানে সদাই ব্যাকুল থাকিত। তাই প্রতিবেশীর মধ্যে সকলের প্রতি তাহার ভাল বাসা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এক একবার তাহার মনেও আশা জাগিত যে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। অর্দ্ধ মলিন সার্টটি গায়ে দিয়া কাঁধে চাদর ফেলিয়া ছাতি মাথায় যখন সে ধীরে ধীরে আফিসের দিকে চলিত তখন তাহার মনে হইত, 'যদি আমার ছেলে মেয়ে থাকিত তাহা হইলে কত বায়না করিত। আমাকে কি সহজে আফিসে আসিতে দিত?' আফিসে টানাপাখার নীচে নিজের টেবিলটির সামনে বসিয়া অনবরত হিসাব করিতে করিতে যখন তাহার মাথা ঢুলিয়া পড়িত, হাত অসাড় হইয়া আসিত, তখন সে ভাবিত, 'আমার ছেলেপুলে থাকিলে কি এরূপে কাজ করিলে চলিত?' আফিসের ছুটির পর অবসন্ন দেহে যখন চিরপরিচিত পথটি দিয়া নিজের বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিত তখন তাহার একটা অভাব বুঝিতে পারিত। কই, আর সকলের ন্যায় তাহাকে ত কেহ আগু বাড়াইয়া লইতে আসে নাই। কোমল বাহু বিস্তার করিয়া কেহ ত বলে না, 'বাবা আমার পুতুল এনেছ?' আহা! সে যদি দেনাটা পরিশোধ করিতে পারে তাহা হইলে আর কোন বাধা থাকে না।

তাই যখনই তাহার মনে পুত্রকন্যাপরিবৃত সংসারের চিত্র জাগিয়া উঠিত, তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত, 'এই যে আগে দেনাটা শোধ করি।'

কিন্তু অন্তর তাহা বুঝিত না। স্নেহের প্রবল ক্ষুধা তাহার প্রতিবেশিগণের সকল সন্তানকে আদর করিয়াও মিটিত না। সে চায় তাহার নিজের একটি শিশু। সেই কেবল তাহাকে ভাল বাসিবে। অন্য কেহ তাহার ভালবাসায় বাধা দিতে পারিবে না।

প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় বসিয়া সে ছেলেদের গল্প বলিতেছে, চাকর আসিয়া ছেলেদের বলিল, "চল, খাবে চল, মা ডাকছেন।" ছেলেরা যাইতে চায় না, কিন্তু গোপীমোহন বুঝে ছেলেদের ধরিয়া রাখিবার কোন অধিকার তাহার নাই। ক্ষুণ্নমনে সে গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়ে। ছেলেরা বলে, "তারপর কি হল দাদা?" গোপীমোহন ক্ষুব্ধচিত্তে বলে, "আবার কাল বলব ভাই।"

পাড়ায় হিংসুকেরও অভাব নাই। গোপীমোহনের স্নেহবলে শিশুহৃদয় বিজিত হইত ইহা কাহারও কাহারও চক্ষুশূল ছিল। গোপীমোহন তাহাদের বাড়ী গিয়া ছেলে কোলে করিলেই কোন-না-কোন অছিলায় তাহারা ছেলেকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইত। কখনও কখনও গৃহিনীর অনুচ্চ মন্তব্যও গোপীমোহনের কানে পৌছিত, "দেখেছ? মিন্‌সের চেহারা দেখেছ?—কি পাকাটে গড়ন! বোধ হয় গুনটুন করে। ছেলেপিলের অকল্যাণ ঘটবে।" হায় গোপীমোহন! দেনা শোধের জন্য অর্দ্ধাশনে তোমার যে দেহ ক্ষীণ!

অতি কষ্টে কোনক্রমে দুই একটা পয়সা বাঁচাইয়া গোপী-

মোহন প্রতিবেশীর কোন ছেলের জন্য একটি বাঁশী বা একটি খেল্‌না কিনিয়া দেয়। তাহার বাপ মা বলে, "ও কি ছাই একটা জিনিস দিয়েছে ?" কিন্তু শিশুর মন টাকার পরিমাণে স্নেহের ওজন করে না। তাই গোপীদাদার এক পয়সার বাঁশিটি পাইয়া সে আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে ও সমস্ত দিন সময়ে অসময়ে বাঁশিটি বাজাইয়া ঘরখানি কাঁপাইয়া তুলে। গোপীমোহন সেদিন বড় আহ্লাদে আফিসে যায় ও স্ফূর্ত্তির সহিত সমস্ত কাজ শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলে।

কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, দেনা শোধ আর হইল না। রবিবারের দুপুরবেলা তক্তাপোষখানির উপর অলস দেহ ঢালিয়া কড়িকাটের দিকে চাহিয়া সে নিজের দুর্ব্বহ ঋণভারের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। স্বপ্নে দেখিত যেন কারাগারে বন্দী, বুকে একখণ্ড পাষাণ চাপান আছে। সেই পাষাণখানি নামাইবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। একবার পাষাণখানি নামাইয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার মুক্তি। কারাগারের বাহিরে কচি কচি ছেলেরা হাসিমুখে ছুটাছুটি করিতেছে, গোপীমোহনকে ডাকিতেছে। চকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত তখন আবার ঋণের কথা ভাবিতে থাকিত। মা আসিয়া বলিত, "ওরে, বেলা পড়েছে, একটু বেড়িয়ে আয় না।"

এইরূপ রবিবারে একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছে এমন সময় বৃষ্টি নামিল। বৈশাখ মাস—অপরাহ্ণ। গোপীমোহন, ছাতা লইয়া বাহির হয় নাই। হঠাৎ ধূলার একটা ঝড় উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার জন্য একটা গলির

ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। শীঘ্রই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

গোপীমোহন সেদিন একটি কাচানো শার্ট ও চাদর বাহির করিয়াছিল। তার পর সপ্তাহেও আপিসে চালাইতে হইবে! কাজেই সে জামা ও চাদর যাহাতে না ভিজে তাহার উপায় করিতে হইবে। গলির ভিতরে গাড়ী বারান্দাওয়ালা বাড়ীও নাই, যে তাহার বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াইবে। পাশে এক খানা খোলার চালের ঘর ছিল, তাহার দাওয়ায় সে উঠিয়া পড়িল।

আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল। বজ্রধ্বনির সহিত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। গলির মাঝে ক্রমশঃ জল জমিতে লাগিল। গোপীমোহন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে জলের ঝাপটাও আসিতে লাগিল। গোপীমোহন সরিয়া দাওয়ার কোণে গেল। সেখানে দেখিল একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর একটি ছেলে ঘুমাইতেছে। দেখিয়া বোধ হয় বয়স সাত আট বৎসর। রং খুব কালো, মাথাভরা চুল। হাত পা গুটাইয়া বালক ঘুমাইতেছে। মাথার কাছে কাগজে জড়ান একটা কি রহিয়াছে।

এমন অসময়ে ছেলেটিকে ঘুমাইতে দেখিয়া গোপীমোহনের ইচ্ছা হইল যে তাহাকে জাগাইয়া দেয়। কিন্তু হঠাৎ বালকটির গায়ে হাত দিতেও সাহস করিল না। কিন্তু সেই ছোট দাওয়াটির কোণেও যখন জলের ঝাপটা আসিয়া পৌছিতে লাগিল, তখন গোপীমোহন আর থাকিতে পারিল না।

আস্তে আস্তে ছেলেটির মাথায় হাত দিল। বালক করস্পর্শে নড়িয়া উঠিল। একবার কাশিয়া পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "বাবা!"

গোপীমোহনের প্রাণে একটা কিসের আঘাত লাগিল। তাহাকে ত' কেহ 'বাবা' বলিয়া ডাকে নাই। বালকের এই কথাটি তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়কেঁ গলাইয়া দিল। বলিল, "ওঠ বাবা, জল পড়ছে ভিজে যাবে।"

বালক চোখ মেলিয়াই দুই হাতে সেই কাগজে মোড়া পদার্থটি তুলিয়া লইল। অপরিচিত গোপীমোহনকে দেখিয়া বলিল, "তুমি কে?" গোপীমোহন অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। বলিল "উঠে বাড়ীর ভিতর যাও। সন্ধ্যার সময় কি এমন করে ঘুমুতে আছে?" বালক বলিল, "আমি ত চলতে পারি না। আমি যে খোঁড়া।" গোপীমোহন তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্যই ত সে খঞ্জ। বলিল, "তোমার বাবা কোথায়?" বালক বলিল, "আমার বাবা নেই। এক বছর হ'ল মারা গেছে।"

"তোমার আর কে আছে?" "মা আছে। দুই ভাই এক বোন আছে।" "তারা কোথায়?" "বাড়ীর ভেতর। ঐ যে তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তারা খেলা কচ্ছে।" তখন বালকটির দুই ভাই ও ভগ্নীটি একখানা কাগজের নৌকা করিয়া বৃষ্টির জলে পূর্ণ নালায় ভাসাইবার চেষ্টা করিতেছিল ও উচ্চরবে কোলাহল করিতেছিল।

গোপীমোহন বলিল, "তোমায় নিয়ে ওরা খেলা করে না?"

বালক বলিল, "আমি যে খোঁড়া। ওরা বলে খোঁড়া হলে খেল্‌তে পারে না। আমি ত চোর্‌-চোর্‌ খেল্‌তে পারি না। আমি বলি, বসে বসে "আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম" খেলি, ওরা তাতে রাজি হয় না। সন্ধ্যের পর কোনও কোনও দিন আমার সঙ্গে খেলে।

"তুমি সমস্ত দিন কি কর?"

"এইখানে মা সকালে বসিয়ে রেখে যায়। আমাকে দেখ্‌লে মায়ের রাগ হয় কিনা। আমি খোঁড়া, কোন কাজ কর্‌তে পারি না। তাই আমি এইখানে থাকি। বাবা আমায় এই বই দিয়েছিলেন; এইটে পড়ি, ভাল বুঝতে পারি না। এখনো ভাল পড়তে শিখি নি কিনা। ছবি দেখি। বাবা আমায় গল্পগুলি সব বলেছিলেন, তাই ছবি দেখেই বেশ বুঝতে পারি।" বলিতে বলিতে বালক খুব কাশিতে লাগিল।

গোপীমোহন বলিল, "তোমার কি সর্দ্দি হয়েছে?"

"না আমার যে অসুখ। মা বলে আমার হাঁপানি হয়েছে। বাবারও হাঁপানি হয়েছিল, তাইতে বাবা মারা গেছে। মা বলে আমি আর বেশীদিন বাঁচব না।" গোপীমোহনের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। অনাদৃত বিকলাঙ্গ রুগ্ন শিশু মাতার আদরেও বঞ্চিত। সামলাইয়া লইয়া বলিল, "দেখি, তোমার কেমন বই?"

বালক তাহার কাগজ মোড়া বইখানি দেখাইল—মলাট দেওয়া বহুব্যবহৃত জীর্ণ বটতলার ছাপা একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ন। বটতলার ছাপা ছবি—বিকট মূর্ত্তি রাক্ষস, গজ কচ্ছপের যুদ্ধ, সবই কিম্ভূতকিমাকার আজগুবি। এই ছবি গুলিই বালকের কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিত ও তাহার নিরানন্দ নিঃসঙ্গ জীবনে শান্তিদান করিত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতেছে। গোপী-মোহন বলিল, "তুমি খাবে না?" বালক বলিল, "এখন না, আলো জ্বালা হলে মা আমার ভাই বোনদের খাইয়ে আমায় নিয়ে

যাবে। আমি খেয়ে তাদের রামায়ণের গল্প বল্‌ব, তারা ঘুমুবে। মা তখন খাবে, বাসন মাজবে। আমি গল্প না বল্লে আমার ভাই বোনেরা মারামারি করে। যখন আমার খুব অসুখ হয় তখন আর বল্‌তে পারি না। ভাইবোনেরা তখন জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলে, আমাকে মারে। তাই আমি রোজই তাদের গল্প বলি।"

এই সময় বাড়ীর দরজা খুলিয়া দীর্ঘাকার এক রমণী বাহির হইল। "ওরে ভুতো! আঃ—জ্বালাতন হয়েছি বাপু! বিষ্টিতে বুঝি ভিজ্‌ছে। এ আপদ যে কতদিন—"

রমণীর কথা শেষ হইল না। গোপীমোহনকে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া বলিল, "আপনি কি চান?" গোপী-মোহন বলিল, "এই বৃষ্টি পড়্‌ছে বলে এইখানে একটু দাঁড়িয়েছি। ছেলেটি বুঝি তোমারই?"

রমণী। হাঁ। দুঃখের কথা কি বল্‌বো বাবু। যেমন আমার পোড়া কপাল, তেমনি ছেলেও হয়েছে। ভুতোর বাপ মারা গিয়ে অবধি আমার দিন চলা ভার। তাও যদি ভুতো কাজ টাজ একটু আধটু করতে পারতো। ওমা, ভাত নামাতে হবে যে। চল্‌রে ভুতো, বাড়ীর ভেতরে চল্‌।" এই বলিয়া ভুতোকে দুই হাতে তুলিয়া লইল। বলিল, "ওটা কি? ওঃ সেই বইখানা? তুই আমার হাড় জ্বালালি। দিনরাত তোর ওখানা বুকে রেখে কি হয় বাপু? অনাছিষ্টি যত। তোকে কে বয় তার ঠিক নেই, আবার একখানা বই।" বালকটি যেন কোন বিপৎসম্ভাবনায় তাহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল বইখানি বুকে জড়াইয়া ধরিল।

গোপীমোহন আর সহ্য করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া জুতা হাতে করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। গলিতে তখন জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

পরদিন বেলা আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সারিয়া গোপীমোহন আফিস যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু আফিসের সোজা রাস্তায় না চলিয়া গোপীমোহন কেন যে সেই গলিটির ভিতর আসিয়া পড়িল তাহা সেই জানে। বালকটি সেই দাওয়ার কোণে বসিয়া রামায়ণের পাতা উল্টাইতেছিল। গোপীমোহনকে দেখিয়াই সে চিনিল ও ম্লানহাস্যে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল। গোপীমোহন দাওয়ায় বসিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল।

সেইদিন হইতে গোপীমোহন দু'বেলা ঐ গলিটি দিয়াই অনেক ঘুরিয়া আফিসে যাইত ও আসিত। বালকটিও গোপীমোহনের আগমনের প্রত্যাশায় থাকিত। উভয়ে কত কথা, কত গল্প হইত। বর্ষাকালে ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেও সহজ রাস্তা ছাড়িয়া জুতা হাতে এক হাঁটু জলের মধ্য দিয়া সেই গলির ভিতর পৌঁছিত। তাহার স্নেহ-ক্ষুধার্ত্ত হৃদয় এইবার এক নিজস্ব স্নেহপাত্র পাইয়াছিল। এখানে তাহার ভালবাসার আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

আফিসে হঠাৎ একদিন গোপীমোহনের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইল। ছোট সাহেব ছুটি লইয়াছেন। বিলাত হইতে একজন নূতন সাহেব তাহার স্থানে আসিয়াছেন। একদিন টিফিনের সময় সাহেব আফিস ঘরে আসিয়া দেখিলেন, অন্য সব বাবু টিফিন করিতে বাহিরে গিয়াছে। কেবল গোপীমোহন হেঁট হইয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া কি লিখিতেছে।

গোপীমোহনের জলখাবার খাইবার পয়সা নাই। আর বিনা প্রয়োজনে বাহিরে গিয়া বাজে ইয়ারকি দেওয়াও তাহার ভাল লাগেনা। সাহেবকে দেখিয়াই গোপীমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সাহেব কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তারপর হইতে প্রত্যহই সাহেব গোপীমোহনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। সে প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময়ে আসে, আর নিজের টেবিলটিতে বসিয়া অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যায়। তখন অন্যান্য বাবুদের মধ্যে কেহ হয়ত মস্ত বড় খাতা খুলিয়া তাহার আড়ালে নভেল পাঠ করিতেছেন। কেহ বা পাশের কাহারও সহিত চুপি চুপি গল্প করিতেছেন। সাহেব শীঘ্রই গোপীমোহনের উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

একদিন আফিসে গিয়া গোপীমোহন শুনিল তাহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। আগামী মাস হইতে সে চল্লিশ টাকা করিয়া পাইবে। শুনিয়া গোপীমোহনের মনে আনন্দের একটা প্রবল তরঙ্গ বহিল। এতদিনের দেনা সে এই মাসে পরিশোধ করিবে।

প্রথম যে মাসে চল্লিশ টাকা মাহিনা পাইল, সে মাসে গোপীমোহন দুইখানি ছবির বই, একটি বাঁশী ও একটা বড় পুতুল লইয়া সেই গলিটিতে গেল। সে দিন তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। বালকটি উৎসুক নয়নে পথের দিকে চাহিয়া ছিল। গোপীমোহন যখন উপহারগুলি বাহির করিল তখন বালকের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। বাঁশীটি বাজাইতেই বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার ভাইবোন ছুটিয়া আসিল। গোপীমোহন এই আনন্দ-দৃশ্য হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকালে আফিস যাইবার সময় যাহা শুনিল তাহাতে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। বালকটির ভাই-বোনেরা খেলনাগুলি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বালক আপত্তি করিয়াছিল বলিয়া তাহার মা তাহাকে কটুবাক্যে গালি দিয়াছে। গোপীমোহন আবার সেইদিন নূতন খেলনা কিনিয়া বালকটিকে বিকালবেলা দিয়া আসিবে এই আশ্বাস দিয়া আফিসে গেল।

সেইদিন ছুটির সময় আফিসের সাহেব গোপীমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি মিঃ হার্টলির বাড়ী জান?" গোপীমোহন সম্মতি জানাইল। সাহেব বলিলেন, "আজ মিঃ হার্টলির টাকার বিশেষ দরকার হইয়াছে। চিঠি দিয়াছেন। তুমি এখনই ৫০০০৲ টাকা তাঁহাকে দিয়া এস। আর কাহারও উপর এ ভার দিতে আমি ইচ্ছা করি না। বিষয়টি গোপনে রাখিবে। রসীদ আনিবে।"

গোপীমোহন টাকা লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। গেটে আসিতেই দরওয়ান বলিল, "বাবুজী, এক আওরৎ হিঁয়া খাড়ি হ্যায়।"

গোপীমোহন দেখিল—ভুতোর মা। বলিল "কি হয়েছে?" ভুতোর মা বলিল, "আর বাবু, আমার পোড়া কপাল। ছেলেটা মর মর। কে-ই বা দেখে। যদি আপুনি একবার—"

"কে? ভুতো? কি হয়েছে তার? আজ সকালে ত তাকে দেখে এলুম।" ব্যগ্রকণ্ঠে গোপীমোহন এই কথা কয়টি বলিল। রমণী বলিল ডাক্তার এয়েছিল, বলে কিনা আর একঘণ্টাও বাঁচবে না। ছেলেটা বড় কাঁদতে লাগ্‌ল—আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে—"

"চল, চল।" বলিয়া গোপীমোহন দ্রুতবেগে বাহির হইয়া পড়িল। সামনে একটা ভাড়াটিয়া গাড়ি যাইতেছিল। তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে হাঁকাইতে বলিল। গাড়ি যখন গলির মোড়ে, তখন গোপীমোহন লাফাইয়া পড়িয়া গাড়োয়ানের হাতে একটা টাকা দিয়া ছুটিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

দাওয়ায় সে বালক নাই। চীৎকার করিয়া গোপীমোহন ডাকিল "ভুতো! ভুতো!" দরজা খুলিয়া বালকের বোনটা আসিয়া দাঁড়াইল। "ভুতো কোথা?"

"ঘরে শুয়ে আছে।"

ঝড়ের মত গোপীমোহন ঘরে প্রবেশ করিল। এ ঘরে পূর্ব্বে সে কখনও আসে নাই। এক পাশে একখানি তক্তপোষ। তাহার উপর মলিন শয্যা। বালকটি তাহার উপর শুইয়া আছে। শ্বাসবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। গোপীমোহন যে কয়টি খেলনা দিয়াছিল তাহা বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ভাই দুইটি ও বোনটি দূরে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে দেখিতেছে। তাহারা খেলনা কাড়িয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ভুতোর পাশে সেগুলি রাখিয়া দিয়াছে। গোপীমোহন তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল "ভুতো"!

উত্তর নাই। একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। গলায় একটা অস্ফুট শব্দ ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দেহটা একবার কাঁপিয়া অসাড় হইয়া গেল।

গোপীমোহন দেখিল—বুকের উপর সেই রামায়ণখানি তখনও রহিয়াছে। পিতৃদত্ত সে উপহারটি আর কেহ কাড়িবার লোভ করে নাই।

*   *   *

পরদিন প্রাতঃকালে সাহেব আফিসের বড় বাবু, চাপরাশী প্রভৃতির সহিত গোপীমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রুক্ষকেশ শ্মশান-জাগরণে উন্মাদপ্রায় গোপীমোহন আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "টাকা কোথায় ?"

বড়বাবু চুপি চুপি বলিলেন, "লোকটা মদ খেয়েছে। এখনও যে এখানে আছে এইটিই আশ্চর্য্য। আমরা ভেবেছিলাম টাকা কড়ি নিয়ে পশ্চিমে চম্পট দিয়েছে। পুলিশেও খবর দেওয়া গেছে। তারা ষ্টেশনে ষ্টেশনে লক্ষ্য রাখ্‌ছে।"

আর একজন বাবু বলিলেন—"নেশা করে' বোধ হয় হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়েছে।"

গোপীমোহন বাঁ হাতে জামার পকেট হইতে ৫০০০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া সাহেবকে দিল। ডান হাতে কি একটা রহিয়াছে। সেইটাকে সে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে।

সাহেব বলিলেন, "তোমার চাকরি গেল। একমাসের অগ্রিম মাহিনা আজ পাঠাইয়া দিব।" বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবে।"

সকলে চলিয়া গেল। পথে বড়বাবু বলিলেন, "ওঃ লোকটা কি ধড়িবাজ! আরও কোথাও থেকে কিছু সরিয়েছে বোধ হয়। ধরা পড়বার ভয়ে আমাদের টাকাটা দিলে বটে, কিন্তু দেখ্‌লে না একটা ছোট বাক্সের মত কাগজে মোড়া কি একটা বুকের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল ?" অন্য বাবুরা একবাক্যে ইহাতে সায় দিল।

পুনর্জ্জন্ম

"এই যে তোর এত চিঠি রয়েছে। তবে যে বলিস্ তোর স্বামী তোকে ভালবাসে না?" এই কথা বলিয়া শশীমুখী সরলার হাত হইতে জোর করিয়া এক তাড়া চিঠি কাড়িয়া লইল।

সরলা ম্লানমুখে বলিল, "মাইরি দিদি, এ সব আগেকার চিঠি। আজ তিন বৎসর হয়ে গেল একদিনও হাসিমুখ দেখিনি। রাত্রিতে ত বাড়ীতেই থাকেন না। দিনের বেলা কখনও কখনও দেখা হয়, তা ভাল করে কথাই কন্ না।"

শশীমুখী তখন চিঠিগুলি পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। হলধর বিবাহের পর বালিকা পত্নী সরলাকে এই চিঠিগুলি লিখিয়াছিল। তখন তাহার নবযৌবন। তাহার পিতার সেকরার দোকান ছিল। হলধর সেই দোকানে সোণার গহনার উপর নক্সার কাজ করিত। হলধর কাজ খুব ভালই শিখিয়াছিল। হলধরের পিতা ও হলধরের উপার্জ্জনে সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে ভাবিয়া হলধরের পিতা রমানাথ কর্ম্মকার তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। স্বজাতীয় ঘরের মধ্যে পাত্রী দেখিতে দেখিতে বালিকা সরলাকে মনোনীত হইল। সরলা সুন্দরী নহে—রং কাল। তবে হলধরও কৃষ্ণকান্তি। কাজেই সরলার কর্ম্মঠ পুষ্ট অবয়ব ও কমনীয়

মুখশ্রী দেখিয়া ও তাহার পিতামাতা কেহ নাই শুনিয়া রমানাথ তাহাকেই পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলেন।

হলধরের তখন প্রথম যৌবন। কাজেই সে সরলাকে নানা রকম বচন-বিন্যাস করিয়া পত্র লিখিত। পত্র লিখন-প্রণালী সে বটতলা হইতে প্রকাশিত একখানি কবিতার বই হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। কত রকমের কবিতা দিয়া কত ভনিতা করিয়া রঙ্গীন চিঠির কাগজে হলধর পত্নীকে পত্র লিখিত। তাহার মর্ম্ম সে নিজেই অনেক স্থলে বুঝিত না। সরলা বালিকা—তাহার ত কথাই নাই। তবু স্বামীর পত্র বলিয়া সলজ্জভাবে সকলের অগোচরে সে বটতলার সেই কবিত্বো-চ্ছ্বাসের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে রহস্যভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার মিশনরি স্কুলে বিনা পয়সার অধ্যয়ন হইতে জন্মায় নাই। কিন্তু সব বুঝিতে না পারিলেও তাহার কিছু ক্ষতি ছিল না। কল্পনায় তাহার মনে স্বামীর অসীম ভালবাসার কথা ফুটিয়া উঠিত ও অবোধ্য পংক্তিগুলির সে মনগড়া অর্থ করিয়া লইত। তাহাতেই তাহার প্রবল আনন্দ—তাহাতেই তাহার পরম তৃপ্তি।

মিশনরী স্কুলের গুরুমা যে হস্তাক্ষর দেখিয়া বাল্যকালে তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিতেন, সেই অপরূপ হস্তাক্ষরে সেও তাহার স্বামীকে পত্র লিখিত। কিন্তু সে সব পত্র নিতান্তই সাদাসিধা। প্রেম-পত্রের মুসাবিদা করিয়া দিবার মত সখী তাহার কেহ ছিল না। পিতামাতার মৃত্যু হওয়াতে সে মামার বাড়ীতে অনাদরে মানুষ হইয়াছিল। অনাবশ্যক গলগ্রহের মত মামার বাড়ীতে অতি সঙ্কোচেই সে বাস করিত। চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম ও টিকিট পর্য্যন্ত হলধরকেই যোগাইতে হইত।

বড় সুখে বড় আশায় সে দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছিল। হলধর তাহাকে কতই না ভালবাসিত। কত কথাই না চিঠিতে লিখিত। সেগুলি পড়িলে এখনও সুখে তাহার অন্তর শিহরিয়া উঠে। শশীমুখী সেই সব চিঠিগুলি যখন পড়িতে লাগিল তখন সরলা অতীত সেই সুখের দিনগুলির বিষয় ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল, ডাকপিয়ন আসিবার সময়টিতে সে কত ছলে সদর দরজার দিকে লক্ষ্য রাখিত। মনে পড়িল, কত লুকাইয়া কয়েক পংক্তি পত্র রচনা করিতে তাহাকে কি চাতুরীই না করিতে হইত!

আর আজ সেই স্বামী তাহার প্রতি বিরূপ। রমানাথ কর্ম্মকার আজ তিন বৎসর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেকরার দোকান উঠিয়া গিয়াছে। হলধর আর কাজকর্ম্ম করে না। পাড়ার কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ছোকরার সহিত মিশিয়া সে এক অপেরার দল খুলিবার চেষ্টায় আছে। একজন ছোকরার বাড়ীর একটি ঘরে এই আড্ডার অধিষ্ঠান হইত। একটা বক্স হারমোনিয়াম, এক জোড়া বাঁয়া তবলা, একখানা মাদুর, গোটা কতক হুঁকা, কলিকা, কিছু তামাক ও টিকা সংগ্রহ করিয়াই অপেরার দল বসান লইয়াছে। সাজ পোষাক কোথা হইতে যোগাড় হইবে তাহা এখনও কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সে ভাবনায় আড্ডা বন্ধ হয় নাই। রীতিমত "সীতার বনবাসের" জমাট মহলা চলিতেছে। হলধর রাত্রিতে বাড়ীতে আসে না। দিবসেও খাইবার সময় ব্যতীত তাহাকে দেখা যায় না। সরলা স্বামীর মুখে দুই একদিন মদের গন্ধও পাইয়াছিল।

এই তিন বৎসর সে কি কষ্টে কাটাইয়াছিল তাহা সরলাই জানে। তাহার শ্বাশুড়ীও পুত্রের পরিবর্ত্তনে তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার দোষেই হলধর খারাপ হইয়াছে এ কথা তাহার শ্বাশুড়ী যখন তখন যাহার তাহার কাছে বলিতেন! সামান্য সামান্য ত্রুটিতে সরলার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার অবধি থাকিত না। তাহার ও তাহার শ্বাশুড়ীর যে দুই চারিখানি অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া একবেলা খাইয়া দিন কাটিত। হলধর রাত্রিতে বাড়ীতে খাইত না। সরলা ও তাহার শ্বাশুড়ী রাত্রিতে অনাহারে থাকিত। দিনের ভাতই জুটে না—তা আবার রাত্রিতে! কোন দিন দুই এক পয়সার মুড়ি খাইত। তা'ও সব দিন জুটিত না। হলধর এক দিনও ভাবিত না, দিনে সে যে ভাত খাইয়া যায়, সে পয়সা আসে কোথা হইতে। কোনও দিন হলধরের মাতা পয়সার কথা বলিলে রাগারাগি করিয়া চলিয়া যাইত। দুই তিন দিন দেখা দিত না।

শশীমুখীর স্বামী ছাপাখানার কম্পোজিটার। সেও আগে হলধরের দলে ছিল। পরে কোনও গতিকে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন তাহার দু' পয়সা রোজগার হইতেছে। এক রকম চলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত খাটিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। সেই অর্থে শশীমুখীর একখানি গহনাও গড়াইয়া দিয়াছে। শশীমুখী স্বামীকে প্রায়ই বলে, হলধরকে সুপথে ফিরাও। কিন্তু হলধর সে ছেলে নয় যে পরের উপদেশ পালন করিয়া নিজের "মরাল কারেজ" নষ্ট করিবে।

কিছুদিন স্কুলে যাইবার ফলস্বরূপ হলধর এই কথা দুইটি শিখিয়াছিল।

আজ শশীমুখী হলধরের চিঠিগুলি পড়িয়া বলিল, "দেখ্ বোন, যদি একটা কাজ করতে পারিস্ ত তোর স্বামী তোকে ভালবাসে।"

সরলা সাগ্রহে বলিল, "কি কাজ দিদি, বল না?"

শ। দেখ্, আমারও দশা একদিন তোর মত ছিল। তোকে এতদিন বলি নি, কিন্তু তোর কষ্ট দেখে আর থাকৃতে পারলুম না। তুই মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে মানসিক কর, আর পাঁচ ফল সিঁদুর চুপড়ী দিয়ে পূজো পাঠিয়ে দে।

স। কত খরচ পড়বে দিদি?

শ। আট আনার কম হবে না। তা তুই আমাকে পয়সা দিস্। আমি সব কিনে টিনে পাঠিয়ে দেব এখন।

স। আট আনা কোথায় পাব দিদি? আমার যে একটি পয়সাও নেই। কাল রাত্রিতে খরচ হবে বলে মা এক পয়সার মুড়ি পর্য্যন্ত কেনেন নি।

শ। আমি আট আনা দিতে পার্তাম, কিন্তু পরের পয়সায় পূজো দিলে ফল হবে না। ধার করে দিলেও ত হবে না। তোর স্বামীর কাছ থেকে যদি কোনও রকমে আট আনা নিতে পারিস্ তা হলেই হ'তে পারে।

স। সে আমার বরাতে নাই দিদি। তা হ'লে আর এত কষ্ট পাই? একটা পয়সা কখনও পাই নাই, তা আবার আট আনা।

শ। তবু দেখিস্ চেষ্টা করে। আমিও কত কষ্ট করে

তবে ওর কাছ থেকে একটা টাকা পেয়েছিলুম। সেই টাকাতে পূজা দিতেই মা সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলে চেয়েছেন।

বাহির হইতে সললার শ্বাশুড়ী ডাকিলেন,—"বৌমা!" সরলা বলিল "আসি দিদি, মা ডাকছেন।" শ্বাশুড়ীকে সে এত ভয় করিত যে তিনি ডাকিলে আর সে বিলম্ব করিতে সাহস করিত না। বিনা কারণেই ত কত গালাগালি সহ্য করিতে হইত। একটু ত্রুটি হইলে ত আর রক্ষা নাই। শশীমুখীও উঠিল, বলিল, আজ যাই, আবার কাল আস্‌বো।"

* * * *

হলধরকে কে বলিয়া গেল তুলার খেলায় বেজায় লাভ,—এক টকা ধরিলে চার টাকা, কেবল একটু হুঁসিয়ার হইয়া নম্বর ধরিতে পারিলেই হইল। হলধর দুই একদিন দু' চার পয়সা ধরিয়া খেলিল। একদিন' চার আনা পাইয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহার বেজায় ঝোঁক হইল, অধিক টাকা তুলার খেলায় ধরিবে। কিন্তু ধাকা পায় কোথায়? বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করিয়া দু' চার দিন খেলিল। বার বার হারিয়া গেল। স্থির করিল, —মায়ের কাছে কিছু টাকার সন্ধান লইতে হইবে।

হলধরের মাতা প্রত্যহ রাত্রি চারিটার সময় গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। সে দিনও যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন,—"বৌমা, আমি নাইতে যাচ্ছি; দরজা বন্ধ কর।"

শীতকাল। সরলার ঘুম একেবারে ছাড়ে নাই। তন্দ্রার ঘোরে শ্বাশুড়ীর কথা শুনিল। মনে করিল, "যাই, দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসি।" কিন্তু শ্বাশুড়ীকে যমের মত ভয় করিলেও কার্য্যে তাহা ঘটিল না। লেপের ভিতর ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ পাশের ঘরে কি একটা শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার স্বামী দাঁড়াইয়া আছে। সরলাকে দেখিয়া হলধর বলিল, "আজ আমি খেতে আস্‌ব না, তাই বল্‌তে এলুম। মা নাইতে গেছে বুঝি?"

সরলা ইঙ্গিতে জানাইল "হাঁ।" হলধর বলিল, "আমি তা'হ'লে যাই।" সরলা বলিল, "একটু দাঁড়াও না। আমার একটি কথা রাখবে?"

হ। কি?

স। আমায় আট আনা পয়সা দিতে পার?

হ। কি হবে? এই নে।

বলিয়া হলধর হাতের মুঠার ভিতর হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সরলার শ্বাশুড়ী ফিরিয়া আসিলে সরলা জানাইল, হলধর সেদিন আহার করিবে না। সুতরাং হলধরের মাতা সেদিন আর রন্ধন করিলেন না। আঁচলে চারিটা পয়সা বাঁধা ছিল, তাহা দিয়া মুড়িমুড়কি কিনিয়া জলযোগ করিলেন—সরলাও তাঁহার পাতে প্রসাদ পাইল।

দ্বিপ্রহরে সরলা শশীমুখীকে জানাইল, সে আট আনা পয়সা তাহার স্বামীর নিকট হইতে পাইয়াছে। আজই পূজা দেওয়া হউক। শশীমুখী শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইল। বলিল,—"আমি এখনই সব জিনিষ-পত্র যোগাড় কচ্ছি। সন্ধ্যার মধ্যেই সব এনে দাম নিয়ে যাব। তুমি একখানি থালা ভাল করে মেজে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে

রাখ। তা'তে করে সব সাজিয়ে দেব।" শশীমুখী চলিয়া গেল।

সরলা সাগ্রহে থালাখানি মাজিয়া গঙ্গাজল দিয়া ধুইল। গলবস্ত্র হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"মা, মুখ তুলে চাও। আমার স্বামীকে সুমতি দাও।"

সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রে থালাখানি লইয়া সরলা শশীমুখীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছু পরে শশীমুখী পাঁচ প্রকার ফল, সিঁদূর চুপড়ী প্রভৃতি লইয়া আসিল। সরলা কম্পিত করে সেগুলি থালায় সাজাইতে লাগিল। তাহার মনে কত আশা! মা কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

সাজান শেষ হইলে থালাখানি শশীমুখীর হাতে দিল। সে ত আট আনার দ্রব্য-পূর্ণ থালা নয়,—তাহার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ঐ থালার সহিত চলিয়াছে। সরলা বাক্স হইতে আধুলিটি বাহির করিতে গেল।

এই সময় বাহির হইতে সরলার শ্বাশুড়ী উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন,—"অ্যাঁ! এ কি হ'ল? আমার বাক্স কে ভাঙ্গলে?"

সরলা, শশীমুখী উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। তাহারা ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সরলার শ্বাশুড়ী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উচ্চ চীৎকারে বোঝা গেল—তাঁহাদের শেষ সম্বল একজোড়া সোণার বালা ও নগত দেড় টাকা তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিয়া কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

শশীমুখী জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন চুরি হ'ল?"

সরলার শ্বাশুড়ী বলিলেন, "তা কি করে জানব? কাল

বাক্স দেখেছিলুম—ঠিক আছে। আজ আর বাক্স খুলি নি। আঁচলে চারটে পয়সা বাঁধা ছিল, মুড়িমুড়কি কিনে খেয়েছি। এখন গিয়ে দেখি—কে চাড় দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে ফেলেছে। কে আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে? হা ভগবান্‌! কাল থেকে যে উপোস করে মরতে হবে। আমার যে ঐ সম্বল ছিল।"

শশীমুখী। এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা। সরলা ত রাত-দিন এ ঘরে রয়েছে। কি করে চুরি হল?

সরলার বুকের ভিতর ধক্‌ করিয়া একটা ঘা পড়িল। তাহার স্বামী ভোর রাত্রিতে সেই বাক্সের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। তবে কি তিনিই—? সে আর ভাবিতে পারিল না। সরলার শ্বাশুড়ীর দৃষ্টি এতক্ষণ থালার দিকে পড়ে নাই। এবার পড়িল। বলিলেন,—"থালায় ও সব কি?"

শশী। সরলা মা সিদ্ধেশ্বরীর পূজো পাঠাচ্ছে, তাই আমি নিয়ে যাচ্ছি।

স-শ্বা। তুমি পয়সা কোথা পেলে বৌমা? কত দাম এর?

শশী। এ সবের দাম আট আনা। সরলার স্বামী কাল ওকে আট আনা দিয়ে গেছে।

স-শ্বা। কই পয়সা দেখি?

সরলা বাক্স খুলিয়া আধুলি বাহির করিয়া দিল। আধুলিটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াই সরলার শ্বাশুড়ী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এ যে আমারই আধুলি! সিঁদুরের কৌটোয় ছিল। এখনও সিঁদুর লেগে রয়েছে। হলধর কেন দিতে যাবে? এ ওরই কাজ।"

সরলা চুপ করিয়া রহিল। শশীমুখী বলিল,—"ও কেন চুরি করতে যাবে? তোমার গুণধর ছেলেই হয় ত চুরি করেছে। তার পর আধুলিটা সরলাকে দিয়ে গেছে।"

সরলার শ্বাশুড়ী তীব্রস্বরে বলিলেন, আমার ছেলে চোর! ঐ হতভাগার ঘরের মেয়েই চুরি করেছে। চুরি করে পূজো পাঠাবার ধুম হচ্ছে। ছোট লোকের ঘরের মেয়ে—জন্মে বাপ মাকে খেয়েছে, বে হয়ে শ্বশুরকে খেয়েছে। ওর জন্যই ত আমার হলধরের অমন দশা। নইলে বাছা আগে কেমন কাজ-কর্ম্ম করত। ওই ছুঁড়ীর পরামর্শে পড়ে সেও বিগ্‌ড়ে গেল। ওমা যাব কোথা? অ্যাঁ—নিজের ঘরে চুরি!"

শশী। তুমি অমন কচ্ছ কেন? কে চুরি করেছে তার ঠিক্ কি?

স-শ্বা। আচ্ছা বলুক দেখি ঐ হতভাগা ছুঁড়ী আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি করে' যে ও চুরি করে নি?

শশী। আচ্ছা তা বল্‌ছে। বল্‌ত সরলা, তোর স্বামী তোকে আধুলি দিয়েছে ত?

সরলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

শশী। তবে কি তুই চুরি করেছিস্!

সরলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ"।

শশী। অ্যাঁ—এই চুরির পয়সায় তুই মা সিদ্ধেশ্বরী পূজো দিতে যাচ্ছিলি? মা জাগ্রত, তাঁর কাছে লুকোন চলে? এই রইল তোর থালা। এমন কাজ আমা হতে হবে না।

এই বলিয়া থালা ফেলিয়া দিয়া শশীমুখী চলিয়া গেল। ফল-গুলি গড়াইয়া পড়িল। সিঁদুর-চুপড়ী উল্‌টিয়া গেল। কত

সাধের কত আশায় সজ্জিত সে থালা। সরলার মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। দেওয়াল ধরিয়া অতি কষ্টে সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথা তখন ঘুরিতেছে।

তাহার শ্বাশুড়ীর কণ্ঠ তখন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। "অ্যাঁ! ঘরের বউ তুই—তোকে বিশ্বাস না করে কা'কে বিশ্বাস করব? তোরই শেষকালে এই কাজ? তুই এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলি? কার জন্যে তুই চুরি করিস্? ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। চুরি করে তুই পার পেয়ে যাবি? মাথার উপর ভগবান্ আছেন। মিট্‌মিটে ডাইন! কিছু জানেন না! লোকে বলে, বউটি লক্ষ্মী। একবার লক্ষ্মীর কাণ্ডটা পাড়াশুদ্ধ সবাই এসে দেখে যাক্। দে—এখন আমার বালা জোড়াটা কোথা রেখেছিস্ বার করে দে, আর একটা টাকা।"

সরলা কথা কহিল না। সরলার শ্বাশুড়ী বলিলেন, "দে বল্‌ছি, নইলে শাণে মুখ রগ্‌ড়ে দেব। ঢং করে দাঁড়ান হয়েছে—যেন কিছু জানেন না। ওঃ—কি সয়তানি তোর পেটের ভিতর! দণ্ডবৎ দণ্ডবৎ, তোকে সত্যি দণ্ডবৎ! চৌদ্দপুরুষেও এমন কথা কখন শুনিনি। বার কর্ হতভাগী, আমার বালা বার কর্। আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে। নোড়া দিয়ে তোর হাত পা ছেঁচে দেব। ভাল চাস্ ত শীগ্‌গির বার কর।"

বলিতে বলিতে সরলার শ্বাশুড়ী সরলার একমাত্র বাক্সটি উঠাইয়া তাহার মধ্যের জিনিষ ঘরময় ছড়াইয়া খুঁজিতে

লাগিলেন। কিন্তু তাহার ভিতর কিছুই পাওয়া গেল না। তখন অতিশয় ক্রোধে সরলার গলা ধরিয়া দেওয়ালে তাহার মুখ ঘসিয়া দিলেন। বলিলেন, "বল্ বল্‌ছি কোথা রেখেছিস!"

সরলার মুখ দিয়া একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি বহির্গত হইল। সে কোনও উত্তর করিল না। আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল, তাহার যেন আসন্নকাল উপস্থিত। মনে মনে বলিতেছিল, "মা সিদ্ধেশ্বরী! তোমার অগোচর কিছু নেই। তুমি আমার স্বামীকে সুমতি দিও।"

সরলার শ্বাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বল্‌লি নি? আবার ভিট্‌কিলিমি হচ্ছে! দাঁড়া, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" এই বলিয়া সবলে তিনি সরলাকে মাটির উপর উপুড় করিয়া ফেলিলেন। সরলা বাধা দিল না। তখন তাহার শ্বাশুড়ী তাহার গ্রীবা ধরিয়া মাটিতে তাহার মুখ ঘসিয়া দিলেন। মাটির উপর দুই তিন ফোঁটা রক্ত দেখা গেল। সরলা অসহ্য যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল, "মা গো!"

এই সময় দ্বারদেশ হইতে কে ডাকিল "মা!" সরলার শ্বাশুড়ী দেখিলেন,—হলধর। হলধরের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। হলধর বলিল, "মা, আমিই তোমার বাক্স ভেঙ্গে চুরি করেছি! ওর কিছু দোষ নেই। আমাকে বাঁচাবার জন্য ও মিথ্যা কথা বলেছে। তুলোর খেলায় আমি বালা বন্ধক রেখে পঞ্চাশ টাকা ধরেছিলুম। হেরে গেছি। মা, এই শেষবার আমায় মাপ করো। আজ থেকে আমি নূতন মানুষ

হবো। আবার সেকরার কাজ করবো।” হলধরের মাতা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, “বোস্। আস্ছি।” এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হলধর ভূলুণ্ঠিতা সরলার দেহ তুলিয়া লইল। বলিল, “সরলা, আমি সব দেখেছি। আমি এতদিন তোমায় চিনি নি। আনায় মাপ করো। আমি কাল থেকে সব বদ্‌খেয়াল ছেড়ে দেব। আবার কাজকর্ম্মে মন দেব। বল, তুমি আমায় মাপ করলে?”

সরলা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, “ছিঃ, ও কথা কি বল্‌তে আছে?”

আনন্দে তাহার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, মা সিদ্ধেশ্বরী তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাহার স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে।

ঠাকুর

(১)

"না বাবা! ঠাকুর কোথা নিয়ে যাবে? ঠাকুর আমি ছেড়ে দেব না।"

"না দিয়ে কি কর্‌বে বাবা! ঠাকুব আর আমাদের সেবা নিলেন কই? লোকে বলে, নারায়ণ-শিলা যার গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকে তার কখনও কোন অভাব হয় না। সাতপুরুষ এ বিগ্রহ আমাদের বাড়ীতে রয়েছে। জ্ঞানতঃ সেবার কখনও কিছু ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা দেখ্‌ছ ত? আজ ঠাকুরের নৈবেদ্য করি, এমন চাল নেই। নিজেরা না হয় উপবাসে মলুম! ঠাকুরকে কি করে উপবাসে রাখি? আর ঠাকুর থাকবেনই বা কোথা? দেনায় বাড়ী বিক্রী হয়েছে। কাল বাড়ী ছেড়ে গাছ তলায় দাঁড়াতে হবে। তাই ঠাকুরের একটা উপায় আগে করতেই হচ্ছে। আমাদের ভাগ্যে ত গাছতলা আর উপবাস।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। বালক পুত্রের চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে দেখিয়া বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন, "যাও নারাণ, খেলা করগে যাও।" ছেলের নাম নারায়ণ।

নারায়ণ গেল না। বলিল, "ঠাকুরকে কোথা দিয়ে আস্‌বে বাবা?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেব, নারায়ণ! সাত

পুরুষ ঠাকুরের পূজা করেছি, বংশে কেহ কখনও মিথ্যা কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই, তবু আমাদের বিনা দোষে, মিথ্যা দেনার ডিক্রীতে বাস্তভিটা গেল। ঠাকুরকে আর কা'কেও দিতে ভরসা হয় না বাবা! আবার কা'রও এমন অবস্থা হবে!"

বড় ক্ষোভেই ব্রাহ্মণ এই কথাগুলি বলিলেন। সাতপুরুষ আগে এই বিগ্রহ তাঁহাদের বাড়ীতে আসে। ৺ মৃত্যুঞ্জয় সার্ব্বভৌম এক সন্ন্যাসীর নিকট এই বিগ্রহটি পান। সেই অবধি পরম যত্নে, পরম ভক্তিভরে সাতপুরুষ ধরিয়া এই পরিবারে দেবসেবা হইয়া আসিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী ছিল। বিস্তর ছাত্র অধ্যয়ন করিত। সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজেই তাহাদের বাসস্থান ও আহারের যোগাড় করিয়া দিতেন। তাঁহার সামান্য কিছু জমী ছিল। ধনি-গৃহেও মধ্যে মধ্যে তিনি বিদায় পাইতেন। ইহাতে একরূপ তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র একরূপ চালাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই এই ব্রাহ্মণ পরিবারের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলনে সংস্কৃত টোল চতুষ্পাঠী একে একে যায় যায় হইতে লাগিল। ইংরাজী সামান্য শিখিলেই ২৫৲।৩০৲ মাহিনার এক চাকরি হয়; কিন্তু সমস্ত জীবন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহামহোপাধ্যায় হইলেও তাহার স্কুলের পণ্ডিত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। এই সকল কারণে সার্ব্বভৌমের সুবিখ্যাত চতুষ্পাঠীতে দুই চারিটি মাত্র ছাত্র দৃষ্ট হইত। ধনিগণও ব্রাহ্মণ-বিদায় আজকাল কচিৎ করিয়া থাকেন। কাজেই সার্ব্বভৌমের বংশধরগণ ক্রমশঃই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে লাগিলেন। শেষে বৃদ্ধ রামকুমার তর্কালঙ্কারের নামে মিথ্যা দেনার ডিক্রী

করিয়া গ্রামস্থ এক দৈবজ্ঞ রামকুমারকে বাসচ্যুত করিবার যোগাড় করিয়াছিল।

রামকুমারের গৃহে অন্ন নাই। সামান্য কুটীর, অর্থাভাবে খড়ের ছাউনি পর্য্যন্ত বহুদিন সংস্কৃত হয় নাই। বৃষ্টি হইলে ঘরের মেঝে ভাসিয়া যায়। গোটাকতক মাটির হাঁড়ী কলসী, পিতলের থালা, গেলাস বাটি, গাড়ু ও কয়েকখানি বস্ত্র ও উত্তরীয় মাত্র তাঁহার সম্পত্তি। এ অবস্থায় রামকুমার বৃদ্ধ বয়সে যে উপার্জ্জন করিয়া মিথ্যা ডিক্রীর দেনা শোধ করিবেন, সে আশা নাই। তাই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া দিতেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

সেদিন সকালে দেবসেবা হয় নাই। নৈবেদ্যের জন্য এক মুষ্টি চাউলও গৃহে নাই। অনাহারে মরিবেন সেও স্বীকার, তবু ব্রাহ্মণ কাহারও কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে সম্মত নন। সকাল হইতে ঠাকুরের কি করিবেন, ভাবিতেছিলেন। অনেক ভাবিয়া ঠাকুরকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়াই মনস্থ করিলেন।

* * * *

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, নারায়ণের ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর লইয়া রামকুমার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বদিন কিছু আহার হয় নাই। তাহার উপর বার্দ্ধক্যে শরীর দুর্ব্বল। স্খলিতপদে ব্রাহ্মণ গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ গেলে তবে গঙ্গার তীরে উপনীত হওয়া যায়।

যাইতে যাইতে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন— "ঠাকুর! আমার অপরাধ লইও না। তুমি আমাদের সেবা না লইলে আমরা কি করিতে পারি? শুনিয়াছি জনার্দ্দন

শিলা যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে গৃহ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বিলাসিতা বা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় কখনও তোমার পূজা করি নাই। কিন্তু তুমি থাকিতে আমার নারাণ যে অন্নাভাবে মরে ঠাকুর !"

"নমস্কার তর্কালঙ্কার মশাই। ঠাকুর নিয়ে কোথা চলেছেন ?"

তন্ময়চিত্ত ব্রাহ্মণ সহসা চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁহার সম্মুখে প্রসন্ন বদনে দাঁড়াইয়া আছেন ! হরিদাস বৃদ্ধ। এই গ্রামে তিনি ধানের কারবার করেন। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। নগদ টাকাও কিছু আছে। সংসারে এক বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রী।

তর্কালঙ্কার একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছেন বলিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইতে লাগিল। অথচ না বলিয়াই বা উপায় কি ? মিথ্যা কথা তিনি জীবনে বলেন নাই। কাজেই স্পষ্ট কথায় নিজের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া হরিদাস চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তর্কালঙ্কার মশাই, আমার এক ভিক্ষা—আমার কথা রাখতেই হবে। আমি আপনার হাতে ধরছি। বলুন কথা রাখবেন ?"

রাম। কি বলুন ? রাখবার হলে নিশ্চয়ই রাখব।

হরি। না আপনি আগে প্রতিশ্রুত হ'ন যে আমার ভিক্ষা দিবেন ? আপনার সাধ্যাতীত কিছু করতে আমি বলব না।

রামকুমারের এত কষ্টেও হাসি আসিল। বলিলেন, "আমি তোমায় ভিক্ষা দেব ? আজ থেকে আমায় ভিক্ষায় বেরুতে হবে।"

হরিদাস। দোহাই আপনার। প্রতিশ্রুত হ'ন।

রাম। আচ্ছা হ'লেম। কি চাই বল?

হরি। ঠাকুরটি আমায় দিন।

রাম। সর্ব্বনাশ! তুমি বল কি? এ ঠাকুর নিয়ে উচ্ছন্ন যাবে! আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—সাতপুরুষ নিষ্ঠার সহিত ভক্তিভরে পূজো করে কি ফল পেয়েছি দেখছ ত? তুমি এ বিগ্রহ বাড়ীতে রাখবে! সর্ব্বনাশ হবে!

হরি। তা হোক্। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন; ঠাকুর দিন।

রামকুমার হরিদাসের হস্তে ঠাকুর সমর্পণ করিলেন। বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—ঠাকুর দিলুম; কিন্তু তুমি এ ঠাকুর বাড়ী নিয়ে যেও না। যে সন্ন্যাসী আমাদের এ ঠাকুর দিয়েছিল সে বোধ হয় আর জন্মে মৃত্যুঞ্জয় সার্ব্বভৌমের শত্রু ছিল; নইলে ঠাকুর বাড়ীতে থাকতে কাল সারাদিন নারাণ আমার ক্ষিদেয় কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে পড়ল!" রামকুমারের চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

হরিদাস বলিলেন, "সে কি! আপনাদের এতদূর হয়েছে? এ কথা আমায় এতদিন জানাননি কেন? বাড়ী যান। আমি আজই একটা কিছু ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি যদি এতদিন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানাতেন তা হ'লে কি এতটা ঘট্‌ত! আমার নাত্‌নী যতদিন একমুটো ভাত পাবে ততদিন নারাণেরও অভাব নেই। আর আমার কাছেও কি বল্‌তে নেই যে আপনার এতদূর দুরবস্থা হয়েছে!"

হরিদাসের নিকট কিছু টাকা লইয়া দৈবজ্ঞ সেই দিনই রামকুমারের বাড়ী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। হরিদাস গ্রামের

মধ্যে ক্ষমতাশালী লোক; তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলে দৈবজ্ঞের এমন সাহস নাই। মনে মনে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেও মুখে সে সব কথাতেই রাজী হইল। হরিদাস তাহাকে টাকা দিলেন। সে বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে গেল—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

এদিকে চতুর্দ্দিকে সংবাদ রটিয়া গেল তর্কালঙ্কারের গৃহদেবতা হরিদাসকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে, 'আমার সেবক বড় কষ্ট পাইতেছে, তুই তাহাকে উদ্ধার কর। আর আমি তার সেবা গ্রহণ করব না। তুই আমার সেবা কর।' হরিদাস তাই তর্কালঙ্কারের গৃহ উদ্ধার করিয়া ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছেন।"

সকলে বলিল, "বড় জাগ্রত ঠাকুর!" দলে দলে চারি পার্শ্বের আট দশখানা গ্রামের লোক আসিয়া বিগ্রহের নিকট মানৎ করিতে ও পূজা দিতে লাগিল।

* * * *

হরিদাসকে বিগ্রহ দিয়া তর্কালঙ্কার যখন গৃহে ফিরিলেন তখন বালক নারায়ণ দৌড়িয়া গিয়া বলিল—"বাবা, এত বেলা পর্য্যন্ত কোথা ছিলে? আমি আজ অনেক ফুল তুলেছি। ঠাকুর পূজো করবে চল।"

তর্কালঙ্কার অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর আমাদের ছেড়ে গেছেন।"

ঠাকুর গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে মনে করিয়া নারায়ণ উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল।

(২)

কে জানে কেন, ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যাইবার পর হইতে হরিদাসের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল। হরিদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পৃথগন্ন হইয়া কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার লোহার কারখানা ছিল। তাহাতে তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। সহসা তাঁহার মৃত্যুতে হরিদাস প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার নিজের ধানের কারবারেও বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। তিনি গ্রামে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে নিত্যই তাঁহার বাড়ীতে একটা না একটা উৎসব হইতে লাগিল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় হরিাসের এই উন্নতি-দর্শনে মর্ম্মাহত হইলেন। বৃদ্ধ বয়সে উপর্য্যুপরি অভাবের তাড়নায় তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়াছিল। তা'র উপর আবার তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হইল। দরিদ্রের পীড়া—ভাল চিকিৎসাও হইল না। গ্রামস্থ কবিরাজ দয়া করিয়া বিনামূল্যে যাহা দিতেন নারায়ণ তাহাই লইয়া আসিয়া পিতাকে সেবন করাইত।

একদিন হরিদাসের বাড়ীতে মহা-সমারোহ। তাঁহার পৌত্রী লক্ষ্মীর ব্রত-উদযাপন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চন্দ্রাতপ, নিম্নে স্বর্ণ-সিংহাসনে ঠাকুরটি রক্ষিত হইয়াছে। চারিদিকে কলরব। দলে দলে লোক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। রামকুমার তর্কালঙ্কারও নারায়ণের হস্ত ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস বলিলেন, "আসুন—আসুন, তর্কালঙ্কার মশাই, ব্রাহ্মণেরা খেতে বস্‌ছে ; চলুন আপনাদেরও বসিয়ে দিই গে।"

নারায়ণ বলিল, "বাবার কাল থেকে জ্বর হয়েছে। কিছু খাবেন না। কেবল ঠাকুরকে প্রণাম করবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে এনেছি।"

হরিদাস। তা হলে উনি এই ঠাকুরের কাছে বসুন। তুমি খাবে চল।

এই বলিয়া নারায়ণকে টানিয়া লইয়া তিনি খাইতে বসাইয়া দিলেন।

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে রামকুমার বসিয়া বসিয়া ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। দুই একজন লোক মধ্যে মধ্যে প্রাঙ্গণ পার হইয়া যাইতেছে, বেশী ভিড় নাই। সকলেই ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে ব্যস্ত। একরূপ নির্জ্জন প্রাঙ্গণে রামকুমার বসিয়া রহিলেন।

মস্তিষ্কের পীড়া, তাহার উপর জ্বরের প্রকোপ। রাম কুমার কাঁপিতে লাগিলেন। সম্মুখে ঠাকুর। এই ঠাকুরই না সাত পুরুষ তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল! কামনাহীন হৃদয়ে এই ঠাকুরেরই না তাঁহারা সাতপুরুষ ধরিয়া পূজা করিয়াছিলেন? ঠাকুর তাহার বিনিময়ে তাঁহাদের কি দিয়াছিলেন? অর্থকষ্ট —অন্নাভাব--মিথ্যা ঋণের মোকদ্দমা—আরও কত ক্লেশ— রোগে ঔষধ নাই, পথ্য নাই। আর ইহাদের গৃহে আসিয়া ঠাকুর ইহাকে লক্ষপতি করিয়াছেন! বিকৃত-মস্তিষ্ক রামকুমার মনে মনে বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি এত অকৃতজ্ঞ! গরীব ব্রাহ্মণের ভক্তিতে তোমার তুষ্টি হয় না,—সোনার সিংহাসনে

বসিয়া সোনার থালায় ভোগ লইতেছ। সাত পুরুষের সেবায় তোমার তৃপ্তি হয় নাই,—হরিদাসের মাহিনা করা পূজারীর পূজাই তোমার মনে ধরিয়াছে! আচ্ছা—থাক তুমি। তোমায় দেখাইতেছি। তোমার ভোগ বাহির করাইয়া দিতেছি!”

সহসা রামকুমারের মনে কি এক উন্মাদ-সুলভ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সেই প্রবৃত্তি-বশে তাঁহার রোগতপ্ত দুর্ব্বল দেহও সবল হইয়া উঠিল; এদিক-ওদিক একবার সন্তর্পনে চাহিয়া রামকুমার ছোঁ মারিয়া ঠাকুরকে সিংহাসন হইতে তুলিয়া লইলেন। ঠাকুর কৃষ্ণবর্ণের শিলাখণ্ড। ঠাকুরকে উত্তরীয়ে জড়াইয়া রামকুমার প্রাঙ্গণের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সকলেই ব্যস্ত, কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। রাস্তায় পড়িয়া, তিনি দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিলেন। উন্মত্ততা তাঁহার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া দিয়াছে—শরীরে অসীম শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে। জরাজীর্ণ ক্ষীণ দেহ, কিন্তু চক্ষু দুটি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী, নেত্র তারকা বিঘূর্ণিত হইতেছে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন “ঠাকুর! মজা দেখাচ্ছি তোমায়; আমার এ দুরবস্থা করে’ হরিদাসের ঘরে বড় সুখে আছ, নয়? যাও, ঐখানে নালার ধারে শুয়ে শুয়ে ভোগ খাও।”

এই বলিয়া রামকুমার ঠাকুর দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দূরে একটি নালা। তাহার পাশে এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। তাহার তলদেশে ইট্ পাটকেল জড় করা ছিল। শিলাখণ্ডটি তাহার উপর সশব্দে পড়িয়া প্রতিহত হইল।

রামকুমার বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “খাও, ঐখানে পড়ে পড়ে ভোগ খাও।” উন্মত্ত ব্রাহ্মণ তীরবেগে

ছুটিয়া যাইতেছিলেন; পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

নারায়ণ বহুক্ষণ পিতার সন্ধান করিয়া শেষে সেই স্থলে পিতাকে দেখিতে পাইল; দুইজন লোকের সাহায্যে পিতাকে গৃহে লইয়া গিয়া বৈদ্য ডাকিতে ছুটিল। বৈদ্য আসিয়া অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন, "আর কেন? গঙ্গা-তীরস্থ করাই বিধেয়।" শুনিয়া নারায়ণের মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

*   *   *   *

গ্রামে তখন হুলস্থূল। ব্রাহ্মণভোজনান্তে হরিদাস পৌত্রী লক্ষ্মী ও পুত্রবধূর সহিত ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া দেখেন, সিংহাসন শূন্য, ঠাকুর নাই। চারিদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে এ কথা প্রচারিত হইয়া গেল। দিকে দিকে লোক ছুটিল। হরিদাস অভুক্ত অবস্থায় সিংহাসনের সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। ঠাকুর পাওয়া না গেলে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না।

কিন্তু ঠাকুর পাওয়া গেল না।

সেইদিন নিশীথে গঙ্গাতীরে রামকুমারের মৃত্যু হইল। পূর্ব্বক্ষণেও ভ্রূকুটি করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "কেমন, টের পেয়েছ ত!"

(৩)

পাড়ার লোক স্থির করিল, ঠাকুর নিশ্চয়ই কেহ চুরি করিয়াছে। চোর ধরিতে হইবে। মাতব্বরগণ একত্র হইয়া ঠিক্ করিলেন, "আচার্য্য ঠাকুরকে দিয়া নল চালানো হউক।"

আচার্য্য ঠাকুর সেই দৈবজ্ঞ। ইনিই রামকুমারের বাল্য

ভিটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিলেন। মাতব্বরগণ গিয়া তাঁহাকে ধরিল—নল চালাইতে হইবে।

নল চালাইবার বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র গ্রামশুদ্ধ লোক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব বাড়ীর সম্মুখে সমবেত হইল। দৈবজ্ঞ একটি বাঁশের কঞ্চি লইয়া, তাহার দুইদিক অখণ্ড রাখিয়া মাঝখানটি চিরিয়া দিলেন। পরে নানাবিধ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে কঞ্চি বা নলটির উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া সিঁদূর মাখাইলেন। পরে বহুবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে মন্ত্রপাঠ করিয়া দুইজন লোককে কঞ্চিটির দুই দিক ধরিতে বলিলেন। দুই জন যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমরা ধরিতেছি।"

দৈবজ্ঞ বলিল, "আল্‌গা কথে ধ'রো বাবা। জোর করো না। যেদিকে নল টান্‌বে সেই দিকে এগিয়ে যাবে।"

সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, নল এক একদিকে টান দিতেছে; ঠিক একদিকে নহে—কখন ডাহিনে, কখনও বা বাঁয়ে যুবক দুখটি অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম শুদ্ধ লোক কলরব করিতে করিতে চলিল।

বহুক্ষণ ঘুরিয়া নল শেষে রামকুমার তর্কালঙ্কারের গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইল। দৈবজ্ঞ মহোল্লাসে বলিল, "এই বাড়ীতে দেবতা নিশ্চয় আছেন। এরাই চুরি করেছে!"

তখন চারিদিকে মহা কলরব হইতে লাগিল। পাড়ার মাতব্বরগণ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "নারাণের মা, আর লুকাবার চেষ্টা করা বৃথা। ঠাকুর বার করে দাও। বাঁড়ুয্যে মশায় কাল থেকে জল পর্য্যন্ত মুখে দেন নি।"

শেষ রাত্রিতে রামকুমারের দাহকার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়া

নারায়ণ মাতার সহিত শোকে ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা এই গোলযোগে নিদ্রাভঙ্গ হইল। নারায়ণের মাতা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শেষে অপমানে, ক্ষোভে, রোষে রোদন করিয়া উঠিলেন।

দৈবজ্ঞ মনে মনে হাসিতেছিল। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহায় ছিল বলিয়া এতদিন সে রামকুমারের বাড়ীখানি গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন হরিদাসের ঠাকুর যখন ইহারা চুরি করিয়াছে প্রতিপন্ন হইল, তখন ঠাকুর পাওয়া যাক্ আর না যাক্, হরিদার আর কখনও নারায়ণ বা তাহার মাতাকে সাহায্য করিবে না। নিরাশ্রয় বিধবা ও বালক দৈবজ্ঞের কূট বুদ্ধিতে পারিয়া উঠিবে না। রামকুমারের ভিটাখানি এইবার তাহার হস্তগত হইবে।

দৈবজ্ঞ তাই কপট বিষণ্ণভাবে বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া বলিতে লাগিল, "কার মনে কি আছে কে জানে বল? এত বড় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশ—এরা কি-না ঠাকুর চুরি কর্‌লে? ওঃ, ভাবলে গায় কাঁটা দিয়ে উঠে! মহাপাতকের ভয় হলো না!"

মাতব্বরগণ তখন নারায়ণের মাতাকে বলিতেছেন, "আর গোলমালে কাজ নেই। তোমাকে একশ' টাকা দেওয়াচ্চি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ হবে, ঠাকুরটি ফিরাইয়া দাও।"

নারায়ণের মাতা অপমানে কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো আমি ঠাকুর চুরি করে রাখব কেন? পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক করেছি, তাই এ জন্মে এত

পাচ্চি। আবার এ জন্মে ঠাকুর চুরি করব? আমরাই ত ঠাকুর দিয়েছি।"

দৈবজ্ঞ হাসিয়া বলিল, "ও সব ভিটৃকিল্‌মি! বাঁড়ুয্যে মশায়ের উন্নতি দেখে আবার ঠাকুর চুরি করে এনেছে। সোজা কথায় হবে না। গোমস্তা মশায় একটু কড়া ক'রে বলুন।"

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুদ্রমূর্ত্তি গোমস্তা তখন বীরদাপে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ, ন্যাকামি রাখ। ভাল চাও ত এখনি ঠাকুর বার কর। নইলে তোমাদের চাল কেটে বাস তুলে দেব। একঘরে করে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে তর্কালঙ্কারের শ্রাদ্ধে আস্‌তে বারণ কর্‌ব। শীগ্‌গির ঠাকুর বার কর।"

চতুর্দ্দশবর্ষীয় নারায়ণ তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ধাবিত হইল। হরিদাস শূন্য সিংহাসনের সম্মুখে ভূমিশয্যায় পড়িয়াছিলেন। নারায়ণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাঁড়ুয্যে মশাই! একি অত্যাচার! আমরা আপনার কি করেছি যে নলচালা দিয়া আমার মাকে চোর অপবাদ দিচ্ছেন? মনে কচ্ছেন, এতে আপনাদের ভাল হবে?"

হরিদাস চাহিয়া দেখিলেন—শ্মশান-জাগরণে রক্তনেত্র রুক্ষকেশ পিতৃহীন বালক কাচা গলায় দাঁড়াইয়া আছে। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। দুঃখে, করুণায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পিতৃবিয়োগ—তাহার উপর আবার এই অত্যাচার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, —"বাবা নারাণ! আমায় ক্ষমা কর। আমি এর কিছুই জানি না। আমি এখনই সেখানে যাচ্চি।"

নারায়ণের মাতা কক্ষতলে মাথা খুঁড়িতেছিলেন; বলিতেছিলেন, "ঠকুর! তুমি আমার এ লাঞ্ছনা দেখ্‌ছ। তুমিই এর উপায় কর। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নাই।"

গোমস্তা তখন হুঙ্কার দিতেছিল—"দিবিনি? তবে মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া।—একি কর্ত্তা আস্‌ছেন যে!"

সকলে দেখিলেন, হরিদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নারায়ণ। হরিদাস আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "কর্‌লি কি? তোরা কর্‌লি কি? ব্রাহ্মণের শাপে আমার সর্ব্বনাশ হবে। কে তোদের নলচালা আন্‌তে বল্‌লে? যা সব দূর হয়ে যা।"

গোমস্তা প্রভৃতি নতমস্তকে সরিয়া গেল।

হরিদাস নারায়ণের মাতার উদ্দেশে যোড়হাত করিয়া বলিলেন, "মা, আমি হাতযোড় কচ্ছি। আমায় ক্ষমা কর। তোমার চোখের জল পড়লে আমার লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ হবে; ক্ষমা কর মা—ক্ষমা কর।"

শোণিতাক্ত রুক্ষ কেশরাশি সরাইয়া নারায়ণের মাতা উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না; দুঃখে, অপমানে জর্জ্জরীভূত তাঁহার হৃদয় আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারিল না—সংজ্ঞা হারাইয়া তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

দৈবজ্ঞ তখন বলিতে বলিতে যাইতেছে, "বাঁড়ুয্যে মশায়ের যেমন কাণ্ড! দিচ্ছিল ও মাগী বার ক'রে, খামকা এসে পড়ে সব গোলমাল করে দিলেন।"

(৪)

কয়েকমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতেই নারায়ণের মাতার জ্বর হইয়াছিল। অত্যাচারে তাহা কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে নারায়ণের মাতা ঘুমাইতেছেন। নারায়ণ মাতার শিয়রে বসিয়া আছে, এমন সময় বাহির হইতে এক নবমবর্ষীয়া বালিকা ডাকিল, "নারাণ দাদা!"

নারায়ণ পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দেখিল—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলিল, "দাদা, তোমার মা কেমন আছে? ঠাকুরদাদা বেদানা মিছরি পাঠিয়ে দিলেন।"

নারায়ণ বলিল, "আয়, ঘরে আয়, আস্তে আস্তে আসিস্। মা ঘুমুচ্চে। কাল সমস্ত রাত্তির মা ভুল বকেচে।"

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট দাঁড়াইল। নারায়ণ বেদানা ও মিছরি রাখিয়া দিল। লক্ষ্মী দেখিল, নারায়ণের মাতা প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন।

নারায়ণ বলিল, "আজ আম পাড়্তে যাস্নি?"

লক্ষ্মী বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা। একবার চল না। খুব বড় বড় আম হয়েচে। আমি উঁচুতে ঢিল ছুঁড়তে পারি না।"

নারায়ণ বলিল, "আজ না লক্ষ্মি—মাকে একলা রেখে যাব না।" বলিয়াই নারায়ণ দেখিল তাহার মাতা জগিয়াছেন। নারায়ণের মাতা বলিলেন, "মা-লক্ষ্মী এসেচ? যাও বাবা নারাণ, খেলা করনা গে। আমি ভাল আছি। জ্বর ছেড়ে গেছে।" বলিয়া রুগ্না উঠিয়া বসিলেন।

নারায়ণ বলিল, "না মা, আজ থাক্। কাল সমস্ত রাত্রি তুমি ভুল বকেচ।"

মাতা বলিলেন, "না রে, যা। লক্ষ্মীকে খুব বড় আম পেড়ে দিগে যা।"

লক্ষ্মী বলিল, "না আমিও এখানে বস্‌চি।

মাতা বলিলেন, "মা লক্ষ্মীর আমার বুদ্ধি কত! আমায় আর যত্ন করতে হবে না মা! আমি আজ বেশ আছি। যাও তোমরা আম পাড়গে, যাও।"

পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নারায়ণ ও লক্ষ্মী আম পাড়িতে গেল।

আম গাছের গোড়ায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী বলিল, "দেখ নারাণ দাদা! আমি ঐ আমটা পাড়ি।" লক্ষ্মী ঢিল ছুঁড়িল; দুইটি আম বোঁটা ছিঁড়িয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পাতাও খসিয়া গেল। ছোট ছোট ডালগুলি নড়িয়া উঠিল।

নারায়ণ বলিল, "আমি ঐ বড়টা পাড়ি।" সে ঢিল ছুঁড়িল; আম পর্য্যন্ত সে ঢিল পৌঁছিল না।

নারায়ণ বলিল, "দাঁড়া ত, একটা বড় ঢিল ছুঁড়ি।" হাত দিয়া কতকগুলি ঢিল হইতে বাছিয়া, অপেক্ষাকৃত একটি বড় ঢিল লইয়া, আবার ছুঁড়িল। এটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

নারায়ণ বলিল, "আচ্ছা, এইবার, এইবার যা ঢিলটা পেয়েছি—আরে একি! লক্ষ্মি, দেখ্ দেখ্, কেমন গোল পাথরটা!—আবার এতে কি একটা তার জড়ান রয়েছে!"

লক্ষ্মী ঝুঁকিয়া পড়িল। "ও দাদা! এযে, আমাদের ঠাকুর! চল—চল—দাদামশাইকে দেখাইগে চল!"

উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

*   *   *   *

নারায়ণের মাতা উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। একবার শেষ দশায় একটু বল সঞ্চার হইয়াছিল, আবার মাথাটা কেমন করিতে লাগিল। মনে হইল এইবার শেষ।—"নারায়ণকে কেন পাঠালুম? শেষ কালে একবার দেখ্‌তে পেলুম না! আমি মলে' নারায়ণের কি হবে? নারায়ণকে কে দেখ্‌বে?" আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন —"ঠাকুর! তুমিই নারায়ণকে দেখো। তার আর কেউ রইল না। তুমি কোথায় জানি না, তোমায় কে নিলে জানি না; কিন্তু যেথায় থাক ঠাকুর; নারায়ণকে দেখো।"

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। হরিদাস নারায়ণ ও লক্ষ্মী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হরিদাস নারায়ণের মাতাকে বলিলেন "মা, ঠাকুর আবার এসেছেন। তোমার নারায়ণই কুড়িয়ে পেয়েছে। নারায়ণের হাত দিয়েই ঠাকুর আমায় দেখা দিয়েছেন। মা, অনুমতি কর, লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন করে দিই।

নারায়ণের মাতা অতিকষ্টে বলিলেন, "কি আর বল্‌ব? আপনি নারায়ণকে জামাই করবেন এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হবে? ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। সাত পুরুষের সেবার ফলে নারাণ আমার আজ লক্ষপতি হ'ল। আমার আসন্নকাল উপস্থিত। নারাণ! কাছে আয়।"

নারায়ণ উচ্চরবে রোদন করিয়া মাতার পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। লক্ষ্মীও আকুলকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

লাঞ্ছিতা

রামহরিবাবু চাপকানটি পরিয়া তালি-দেওয়া জুতাটিতে পা গলাইয়া দিতে দিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা সাড়ে নটা। উর্দ্ধশ্বাসে না ছুটিলে আর ১০ টার মধ্যে আফিসে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। তাড়াতাড়ি জুতা পরিয়া ছাতাটা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইবেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বলি, চল্লে কোথা? যত জ্বালাতন সব কি আমি একা ভোগ করব? তোমার কি একটু হুঁস্ নেই? এমন ঝঞ্ঝাটে কি মানুষ পড়ে? একে ত কাজ করে করে অবসর নেই, তার উপর আবার এ রকম উৎপাত হ'লে বাঁচব কি করে?"

রামহরিবাবুর তখন কণ্ঠশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও চলে। কারণ তিনি দশ বৎসর অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিতেছিলেন যে ব্যাপারটা বুঝিতে গেলে আজ আর আপিসে যাওয়া হবে না। কাজেই বুক ঠুটিয়া ছাতা লইয়া নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য সদর দরজা খুলিলেন। দরজার পথের উপর একটি দশ বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। মেয়েটি এক হাতে কাপড় দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। মেয়েটি রামহরিবাবুর মৃত ভ্রাতার কন্যা।

রামহরিবাবু বলিলেন, "কি হয়েছে রে পুঁটি? কপাল কাটল কি করে? দেখি, ওঃ এতখানি কেটেছিস্? চ, চ,

বাড়ীর ভেতর চ, পটি বেঁধে দিই গে! রক্তে কপালখানা ভেসে গেল যে। কাটুলি কিসে? অ্যা?"

পুঁটি কেবল কাঁদে, কথা কয় না। রামহরি বাবু তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গামছা ভিজাইয়া মাথায় পটি বাঁধিয়া দিলেন। 'কি হয়েছে?' পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কাকিমা মেরেছে।"

পুঁটি আজ এ অভিযোগ কেন করিল জানি না। ইতিপূর্ব্বে কাকার কাছে কাকিমার নামে কোনও অভিযোগ করিয়া কখনও কিছু ফল পায় নাই। যেদিন কাকিমার অসাবধানতায় বিড়ালে দুধ খাইয়া যাওয়ার পর তাহার কাকিমা খানিকটা দুধ জলে মিশাইয়া রান্নাঘরের মেঝের ঢালিয়া দিয়া রামহরিবাবুকে শুনাইয়াছিল, "এমন হতভাগা মেয়ে ত বাপু বাপের জন্মেও দেখি নি। যত হুড়োহুড়ি খেলা রান্নাঘরের ভেতর। এক কড়া দুধ গেল, ছেলে পুলে সব খায় কি?" সেদিন পুঁটি কাকাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ব্যাপারটা কি। কাকা বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে উত্তরে কেবল বলিয়াছিলেন "চুপ্ কর্। চুপ্ কর্।" আবার যেদিন তাহার কাকিমা তাক হইতে পাথরবাটি পাড়িতে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও রামহরিবাবুর কাছে নালিশ করিলেন, "এত বড় মেয়ে, একটুও শাসন নেই। আমি ত আর পারি না। সকাল থেকে আবদার ধরলে পাথর বাটি নিয়ে খেলা কর্‌ব। কত বারণ করলুম, ভেঙ্গে যাবে। ওমা, তা কি মেয়ে শোনে! না হয় নিগ্‌গে বাপু, এই বলে ত বাটিটা দিলুম। তিলেকৃকে সেই বাটিটাকে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌লে। এমন কর্‌লে

কি সংসারে লক্ষ্মী থাকে?" সে দিনও পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নির্দ্দোষিতার কথা কাকাকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কাকাবাবু তাহাতে একটিও কথা কন নাই। কেবল কাকিমা গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আবার মিথ্যে কথা? অতটুকু মেয়ের ভেতর এতখানি সয়তানি?"

এইরূপ অনেক দিন গিয়াছে কিন্তু আজ আবার কি প্রত্যাশায় পুঁটি এ কথা বলিল তাহা বুঝিতে পারি না। হয় ত মনে করিয়াছিল কাকিমা তাহাকে যে কাঠের বাড়ি মারিয়া রক্তপাত করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাহার কাকা বাবুর দয়া হইবে। হয়ত ত তাহার আঘাত দেখিয়া কাকাবাবু বুঝিবেন যে দোষ তাহার কিছুই নাই। কি ভাবিয়া পুঁটি বলিল 'কাকিমা মেরেছে' তাহা জানি না, কিন্তু যেই সে এই কথা উচ্চারণ করিল অমনি ঝড়ের মত তাহার কাকিমা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

"আমি মেরেছি! ওগো দেখে যাও একবার মেয়েটার কাণ্ড দেখে যাও। তোমার ঘড়িটার কি অবস্থা করেছে একবার দেখ।"

"অ্যাঁ? আমার ঘড়ির কি করেছে?" রামহরিবাবু ছুটিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার এক মাত্র ক্লক ঘড়িটি ব্রাকেট সমেত দেওয়াল হইতে মেঝেয় পড়িয়া চুর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে একখানা উঁচু টুল। তাহার উপর উঠিয়া কেহ ব্রাকেট টানিয়াছে।

রামহরি বাবু ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। পুঁটির আঘাতের কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "পাজি

মেয়ে, দাঁড়া, আজ তোকে বাড়ী থেকে দূর করে দেবো, তবে আমার অন্য কাজ।"

এই বলিয়া রামহরি বাবু দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

তখনও কাকিমার ঝঙ্কার উঠিতেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা গালাগালির পর কাকিমা আহারাদি করিলেন। পুঁটিকে কেহ খাইতে ডাকিল না। মাথার বেদনায়, ক্ষুধার জ্বালায় সে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় তাহার কাকিমার উচ্চ কণ্ঠ শুনিতে পাইল "বলি, পড়ে থাকলে সংসার চল্‌বে কি? যা চট্ করে দোকান থেকে এক পয়সার হলুদ কিনে নিয়ে আয়। খোকা কাঁদছে, কোলে করে নিয়ে যা।"

পুঁটি গালাগালির ভয়ে পয়সা লইয়া খোকাকে কোলে করিল। খোকা তাহার কাকিমার ছেলে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। হাতে ছোট সোনার বালা। গায়ে একটি ফ্লানেলের জামা।

পুঁটি খোকাকে কোলে করিয়া রাস্তায় বাহির হইল। তখনও মধ্যে মধ্যে রোদনবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একজন লোক তাহাকে বলিল "কি হয়েছে খুকী? কাঁদছ কেন?"

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, লাল র‍্যাপার গায়ে টেড়িকাটা একজন যুবক। তাহার পায়ে বার্নিশ করা জুতা। কোঁচান কালাপাড় কাপড় পরা। পুঁটি কিছু বলিল না।

আগন্তুক বলিল, "কাঁদ্‌ছ কেন? ক্ষিদে পেয়েছে? চল তোমায় খাবার কিনে দিই গে।"

পুঁটির সেদিন সকাল হইতে কিছুই আহার হয় নাই।

ক্ষুধায় তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সে আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দুই তিনটি রাস্তা পার হইয়া একটি গলির মোড়ে পৌছিয়া আগন্তুক পুঁটিকে বলিল, "ঐ দোকান থেকে দু' আনার খাবার নিয়ে এস। খোকাকে আমার কোলে দাও। খাবার নিয়ে এখানে এনে এই রকে বসে খাও। তারপর খোকাকে নিয়ে যাবে।" পুঁটি খোকাকে আগন্তুকের কোলে দিয়া গলির ভিতর ঢুকিল। খানিকটা দূরেই একখানা খাবারের দোকান।

খাবার কিনিয়া গলির মোড়ে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, খোকা রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। আগন্তুক নাই।

সর্ব্বনাশ! খোকার হাতের সোণার বালা? পুঁটির গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। খোকার বালা কি হইল?

পুঁটি আর দাঁড়াইতে পারিল না। রকে বসিয়া পড়িল। রকে বসিয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পাশে খাবারের ঠোঙা পড়িয়া রহিল। তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। খোকা একখানা জিলিপি টানিয়া লইয়া কামড়াইতে লাগিল ও মুখের লালে ও জিলিপির রসে জামা ভিজাইয়া তুলিল।

শেষে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। পুঁটি তখন খোকাকে কোলে লইয়া থামাইবার চেষ্টা করিল। খোকা কিছুতেই থামিল না। ক্রমশঃই তাহার কান্না বাড়িতে লাগিল। তখন পুঁটি খোকাকে কোলে করিয়া খাবারের ঠোঙা লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ী ঢুকিতে আর তাহার পা উঠে না। শেষে, কি ভাবিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে পুঁটি প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। দরজা পর্য্যন্ত তাহার পিছনে কে দৌড়াইয়া আসিল। তাহার পর সদর দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। খিল পড়িল। পুঁটি তাহা দেখিল না। সে তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।

তাহার কাকিমার ছেলে-মেয়েরা তখন মহা উল্লাসে খাবার গুলি খাইতেছিল।

সন্ধ্যাকালে কলিকাতার গ্রাণ্ড হোটেলের সম্মুখে মহা জনতা। চতুর্দ্দিক বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। কত মোটর গাড়ী কত বিচিত্র যান সাহেব বিবিদের আনিয়া হোটেলের সম্মুখে নামাইয়া দিতেছে। রাজপথের দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচের ভিতর দিয়া হোটেলের ভিতর সজ্জিত কত কি জিনিস দেখা যাইতেছে। ভিতরে ভোজনের মহা আয়োজন। শত শত পরিচারক সুদৃশ্য কাচপাত্রে উষ্ণ খাদ্যসামগ্রী বহন করিতেছে। কত মদ্য, কত পনীর। কতই না ভোজনের উল্লাস।

বাহিরে শীতের কন্‌কনে বাতাসে একখানি কাপড়ে কম্পান্বিত দেহখানি জড়াইয়া ক্লান্ত চরণে ঘূর্ণায়মান মস্তকে পুঁটি সবিস্ময়ে হোটেলের গবাক্ষগুলির দিকে চাহিয়া ছিল। সে সমস্ত দিন পথে পথে ছুটিয়াছে। পরিধানে সেই রক্তসিক্ত বসন। সে দূর হইতে হোটেলের মোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবিতেছিল, "ঐ বুঝি স্বর্গ। ওখানে গেলে বুঝি ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ থাকে না।"

"এই ও, হট যাও, হট যাও।" দরোয়ান হাঁকিল।

পুঁটি অবসন্নপদে লোলুপদৃষ্টিতে হোটেলের সজ্জিত কক্ষ দেখিতে দেখিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

*　　　　*　　　　*

পরদিন সকাল বেলা রামহরিবাবু দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার পাড়ার গোবিন্দবাবু বলিলেন কি রামহরি বাবু, কোথা যাচ্ছেন?"

"একবার থানায় যাচ্ছি। আমার ভাইঝিটিকে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বলেন কি? সর্ব্বনাশ! এই যে কাগজে পড়ছিলুম—"

"কি? কি?"

গোবিন্দ বাবু সংবাদপত্রে একটী প্যারা দেখাইয়া দিলেন।

"সন্দেহজনক মৃত্যু। গত কল্য রাত্রি বারটার সময় জনৈক সাহেব গড়ের মাঠের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষতলে এক বালিকার মৃতদেহ দেখিতে পান। বালিকার বয়ঃক্রম দশ এগার বৎসর হইবে। পরিধেয় বসন রক্তাক্ত। দেখিলে সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূতা বলিয়া মনে হয়। পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছে। বোধ হয় অলঙ্কারের লোভে কেহ ইহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে।"

স্মৃতিরক্ষা

একদিন সন্ধ্যার সময় একটি সভা ভঙ্গের পর দলে দলে লোক আসিয়া গোলদীঘির পাড়ে সমবেত হইতেছিল। অনেকের মুখে অপ্রসন্নতা ও ক্রোধের চিহ্ন। কেহ কেহ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কেহ বা মৃদুস্বরে বন্ধুর সঙ্গে সভার বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ছাত্রের দলে এই সভাসম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

সভার উদ্দেশ্য একজন অধ্যাপককে সম্বর্দ্ধনা করা। সংস্কৃত কলেজের একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবভূতি ভট্টাচার্য্য বিলাতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক পদবীলাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়াতে তিনি ইউরোপের বহুবিধ প্রাচ্যজ্ঞান-সভার সভ্যও মনোনীত হইয়াছেন। কলিকাতার বন্ধুবর্গ, শিক্ষিত জনগণ ও ছাত্রবৃন্দ তাই আজ একটি সভা করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল। সেই সভা ভঙ্গের পরই সভায় উপস্থিত জনগণের মনে এই অপ্রসন্নতার উদ্ভব।

গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর কতকগুলি ছাত্র বসিয়াছিল। আর একজন ছাত্র সেখানে আসিতেই তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "কি কালী! এত দেরী যে! সভায় গেলে না?"

কালী। না ভাই, আসতে পারি নি। বাড়ীতে কাজ ছিল। সভায় কি হ'ল?

"সভায় তো হুলুস্থূল। পণ্ডিত মহাশয় যে এতবড় দাম্ভিক তা আমরা আগে জানতুম না। তা হলে সভা করে এরকম অপদস্থ হতুম না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"দস্তুরমত অপমান। আমাদের সম্বর্দ্ধনা তিনি উপেক্ষা করেছেন।"

"কি ব্যাপারটা খুলেই বল না।"

"ব্যাপার আর কি? আমরা আজ তাঁকে দেওয়া হবে বলে, ফুলের মুকুট আর ফুলের হার আনিয়েছিলুম, জান ত? জরির-কাজ করা এই ফুলের মালা আর মুকুট তৈরি করাতে কত হাঁটাহাঁটি তাও ত তুমি জান। আজ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যখন বল্‌লেন, আমাদেয় স্বর্ণ রৌপ্য আভরণ দিবার ক্ষমতা নাই, সামান্য ফুলের আভরণ গ্রহণ করুন, তখন পণ্ডিত মহাশয় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লেন, 'থাক্ থাক্, ফুল আমায় দেবেন না। ফুল আমি নিতে পার্‌বো না। এমন হবে আমি পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারি নি। তা হলে আগে থেকেই আপনাদের বারণ কর্‌তুম।' তখন সভার চারিদিকে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। এই অবিনয়, অশিষ্টাচার দেখে সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। সভাপতি মহাশয় না থাক্‌লে শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুষ্কর হ'ত।"

কালী। তা এরকম বলার কারণ কি তা বুঝ্‌তে পার্‌লে কি? পণ্ডিতমহাশয় আর কিছু বল্‌লেন না?

"হাঁ তিনি পরে বল্‌লেন যে কোনও বিশেষ কারণে আমি জীবনে ফুল স্পর্শ কর্‌ব না প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই

ফুলের মালা ও মুকুট নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি বল্‌তে গিয়ে কথাটা স্পষ্ট করে বল্‌তে পারিনি। তার জন্যে আমার অবিনয় ও অসৌজন্য প্রকাশ হয়েছে। আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

কালী। তবে আর কি? এই ত কারণ বোঝা যাচ্ছে।

"আরে তুমিও যেমন! এ কথা তুমি বিশ্বাস কর? কি এমন কারণ যে ফুল স্পর্শ কর্‌বেন না। ও সব কিছু নয়। প্রথমে স্পষ্ট মনের ভাবটা বেরিয়ে পড়েছিল, পরে সভায় গোলযোগ দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন।

কালী। নিন্দা কর্‌তেই হবে? ভালটা বুঝি আর ভাব্‌তে নেই?

"কারণ থাক্‌লে তিনি তা বল্‌লেন না কেন? জ্ঞানবাবু সভাতেই বল্‌লেন, আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ফুল স্পর্শ না করার কারণ জান্‌তে চাই। প্রকাশ্য সভাতেই তিনি তার উত্তর দিন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বল্‌লেন, সভায় সে কথা বলা অসম্ভব; সে সময়ও নাই, আমার সে কথা প্রকাশ্য সভায় বল্‌বার সামর্থ্যও নাই। আপনারা আমায় বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের অসম্মান কর্‌বার জন্যে ফুল প্রত্যাখ্যান করিনি।"

কালী। এইতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে তিনি অহঙ্কৃত গর্ব্বিত, বিনা কারণে তোমাদের অপমান করেছেন? দেখ, বাঙ্গালীর স্বভাব পরশ্রীকাতরতা, কিন্তু তোমরা তার চরমে উঠেছ।

"আচ্ছা, তোমার মত অন্ধভক্ত আমরা নই। কি দম্ভ!

আর কি গবেষণাই বা করেছেন? সবই ইংরেজির তর্জ্জমা ত? উল্‌টে পাল্‌টে লেখা বৈ ত নয়।"

কালী। দেখ্ নৃপেন্, বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্। পণ্ডিত মহাশয়ের সমালোচনা কর্‌বার ক্ষমতা তোর এ জন্মে হবে কি না সন্দেহ। মিছে বকিস নি। নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, না হলে পণ্ডিত মহাশয় এমন বল্‌তেন না।

নৃপেন। কি—কারণটা কি?

"কারণ শুন্‌বে নৃপেন—"

ছাত্রেরা চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল অধ্যাপক ভবভূতি ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন, নৃপেন খাড় হেঁট করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘাসের উপরই বসিলেন। ছাত্রেরা সসম্ভ্রমে সরিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "দেখ, কেন আমি ফুলের মালা নিতে পারি নি তা সভাতে বল্‌তে পারিনি। আমি বেশী কথা বলি, গুছিয়ে সংক্ষেপে সে কথা বলা আমার ক্ষমতায় হ'ত না। আর যে জন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা সে কথা ভাবতে এখনও আমার চোখে জল আসে। আমি তা সভায় কি বল্‌তে পারি? তোমরা আমার ছাত্র। তোমাদের কাছে আজ আমি আমার জীবনের কথা প্রকাশ করছি।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাজপথে ও বাগানের ভিতর গ্যাস জ্বলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা ঝি-চাকরদের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছ। স্থলে স্থলে ছাত্রের দল বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা মণ্ডলাকারে বসিয়া নানা কথা বলিতেছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন ধীরে ধীরে তাঁহার কাহিনী অরম্ভ করিলেন।

আমার বাবার চতুষ্পাঠীতে যাহারা পড়িত, তাহাদের মধ্যে বিদ্যালঙ্কার দাদার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল। তাঁহার পূরা নাম কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। চতুষ্পাঠীর সকলে তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার' বলিয়া ডাকিত। আমি শুধু 'দাদা' বলিতাম। আমি জন্মাবধি বিদ্যালঙ্কার দাদাকে আমাদের চতুষ্পাঠীতে পড়িতে দেখিয়া আসিতেছিলাম। চতুষ্পাঠীতে কত ছাত্র আসিত। কেহ কাব্য, কেহ দর্শন পড়িত। পড়া শেষ হইয়া গেলে তাহারা গৃহে চলিয়া যাইত। আবার নূতন ছাত্র আসিত। বিদ্যালঙ্কার দাদার কিন্তু পড়া শেষ হইত না। বাবা আর সকল ছাত্রকে পড়াইতেন। দাদা কিন্তু কোনও দিন বাবার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইতে যাইতেন না। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কাব্য পড়িত, দাদা তাহাদেরই একজনের নিকট নিজ পাঠ বুঝাইয়া লইতেন। দাদা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের একটি দপ্তরের অধিকারী ছিলেন। তাহাতে নৈষধচরিত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি বহু পুরাতন মলিন জীর্ণ-শীর্ণ পুঁথি ছিল। নিত্যই সে দপ্তর হইতে এক একখানি পুঁথি বাহির হইত। দাদা ধীরে ধীরে দপ্তরটি খুলিয়া টিপ্পনীযুক্ত মলিন নৈষধচরিত বা শিশুপালবধ বাহির করিয়া পড়িতে বসিতেন, কত যুক্তাক্ষর-বহুল শ্লেক, কত অনুপ্রাস-যমক-যুক্ত শ্লোক দাদা পড়িতেন। আমি গেলে দাদার আর পড়া হইত না। "আজ এই পর্য্যন্ত থাক্" বলিয়া দাদা পুঁথিগুলি সযত্নে দপ্তরে বাঁধিয়া আমায় বলিতেন, "কি চাই

ভবভূতি ?” তাঁহার কাছে আমারও আব্দারের অন্ত ছিল না।

বাবা বা মার কাছে আবদার করিবার সুযোগ পাইতাম না। বাবা সারা দিন অধ্যাপনা লইয়াই ব্যস্ত। চতুষ্পাঠীতে প্রায় ত্রিশজন ছাত্র ছিল। তাহারা আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। এতগুলি ছাত্র পড়ান, তার উপর নিজের সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা প্রভৃতিতে বাবার এক মুহূর্ত্তও অবকাশ থাকিত না। আমায় আদর করিবেন কখন ? মাও সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। এতগুলি ছাত্রের জন্য তিনি একেলাই রন্ধন করিতেন। তার উপর সংসারের সমস্ত ভার। কোন জিনিষটা ফুরাইয়া গেল, কি আনিতে হইবে প্রভৃতি সমস্ত মা-ই করিতেন। বিদ্যালঙ্কার দাদা জিনিষপত্র কিনিয়া আনিতেন। অন্যান্য ছাত্র কেহ মধ্যে মধ্যে সঙ্গে যাইত। বাবার পূজার সমস্ত যোগাড় মাকে করিতে হইত। দুর্ব্বা বাছা, ফুল সাজান, চন্দন ঘষা প্রভৃতি সমস্ত কাজ তিনি নিজ হাতে করিতেন। কাজেই মার কাছেও আবদার করিবার অবসর আমি মোটেই পাইতাম না। কেবল সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে আমি মায়ের কোলের কাছে শুইয়া পড়িতাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প বলিতেন। গল্পের কিয়দংশ শুনিতে শুনিতে অতর্কিতে আমার নিদ্রালস নয়ন ঢুলিয়া আসিত। স্বপ্নে সোনার কাঠি রূপার কাঠি শিয়রে রাজকন্যা, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র প্রভৃতি ছায়ার ন্যায় ভাসিয়া উঠিত।

মা ও বাবার কাছে সুযোগ পাইতাম না বলিয়া বিদ্যালঙ্কার

দাদার কাছে অজস্র আবদার করিতাম। নিত্যই আমার লিখিবার তালপত্র, কলম দাদাই সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ভুসা হইতে মসী প্রস্তুত দাদা না হইলে হইত না। কোনও দিন দাদাকে ধরিতাম, "দাদা, একটা ধনুক নেবো।" দাদা অমনি কাটাবি লইয়া বাঁশ চিরিয়া বাঁকারি প্রস্তুত করিয়া ধনুক-নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। দীঘির দূরতম বা বৃহত্তম শালুকটি দাদা আমার জন্য তুলিয়া আনিয়া দিতেন। ময়রার দোকান হইতে বাতাসা বা খইচুরও দাদাকে মধ্যে মধ্যে কিনিতে হইত, নহিলে আমার ক্রন্দন থামিত না। বাবাকে লুকাইয়া যাত্রা শুনিতে যাওয়াও বিদ্যালঙ্কারদাদার সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব ছিল।

উপনয়ন হইবার বহু পূর্ব্বেই আমি বাবার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বাবা সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমি ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন অধ্যাপক হইয়া পড়ি। বিশেষতঃ ন্যায়-শাস্ত্রে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যে আমাকে হইতেই হইবে তাহা আমার অক্ষর পরিচয়ের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। বাবা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। বহুদূর হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র আসিত। বড় বড় সভায় কূটতর্কে শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি কতবার সর্ব্বোচ্চ বিদায় ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আমাকে পাঠে মনোযোগী করিবার জন্য বহুবার তাহা বলিতেন, আমার মনেও যে উচ্চ আশা জ্বলিয়া উঠিত না তাহা নহে। কিন্তু আমার লেখাপড়ায় উৎসাহ যে বাবার আশানুরূপ ছিল না তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম।

পরিচিত পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট বাবা বলিতেন, "ভবভূতি আমাদের সংশের মর্য্যাদা রাখিবে।" পণ্ডিতবর্গও আমার প্রণতশীর্ষে পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন "ভবভূতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবে।" তর্কবাগীশ মহাশয় নস্য লইয়া বলিতেন "সর্ব্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।" কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে এইরূপভাবে আমার প্রশংসা করিলেও অন্তরালে বাবা আমাকে বলিতেন, আমি অলস, লেখাপড়ায় আমার মন আদৌ নিবিষ্ট হয় না।

বাস্তবিকই, প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্পচয়ন আমার খুব প্রিয় ছিল বটে; কিন্তু তার পর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মুগ্ধবোধ খুলিয়া আবৃত্তি করিবার সময় অজ্ঞাতে আমার মন সম্মুখবর্ত্তী দীঘির জলের দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষেদের হাঁসগুলি সূর্যকিরণে রঞ্জিত দীঘির জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিত, ডানা ঝাড়িত। বৃদ্ধ ঘোষজা মহাশয় ঘাটে বসিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে দন্তধাবন করিতেন। কখনও কখনও দুএকটি অচেনা পাখী রঙ্গিন ডানা মেলিয়া উড়িয়া আসিয়া দীঘির পাড়ে নারিকেল গাছের উপর বসিত। কখনও কখনও ছোট মেয়েরা কলসী কাঁকে লইয়া জল লইতে আসিত। আমার মুগ্ধবোধ আবৃত্তি অজ্ঞাতসারে কখন যে বন্ধ হইয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতাম না। বাবার গম্ভীর তিরস্কারব্যঞ্জক স্বর কর্ণে পৌঁছিলে সহসা চমক ভাঙ্গিয়া যাইত। কিছুক্ষণের জন্য আবার বিষম উৎসাহের সহিত কঠোর সূত্রগুলি উচ্চস্বরে পড়িতে থাকিতাম।

এইরূপভাবে সকাল বেলার পাঠ সাঙ্গ হইত। তাহার

পর ছুটি। তখন মহা আনন্দে বিদ্যালঙ্কার দাদাকে ধরিতাম "নাইতে যাবে চল।" বিদ্যালঙ্কার দাদা আমায় লইয়া গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী সুবিশাল দীর্ঘিকায় স্নানার্থ গমন করিতেন। তীরে একটি সুন্দর শিবের মন্দির। দীঘির জলে শালুক ফুটিত। বিদ্যালঙ্কার দাদা সাঁতার দিয়া আমায় শালুক ফুল আনিয়া দিতেন। আমি তখনও ভাল সাঁতার শিখি নাই। দাদাকে ধরিয়া এক একবার সাঁতার দিবার চেষ্টা করিতাম। স্নানান্তে শিবকে প্রণাম করিয়া স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে বিদ্যালঙ্কার দাদা বাড়ী ফিরিতেন। শুনিয়া শুনিয়া আমারও স্তবটি মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমিও দাদার সঙ্গে বলিতে বলিতে আসিতাম

"প্রভুমীশ মনীশ মশেষ গুণম্।"

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আমার কোন কাজ ছিল না। তখন গাছে ওঠা ও ফল পাড়া আমার প্রধান কাজ ছিল। গ্রামের যত দুরন্ত ছেলের সর্দ্দার ছিলাম—আমি। যাহাদের ফলবান্ বৃক্ষ ছিল তাহারা প্রায়ই বলিত "ভট্চাযদের ছেলেটার জ্বালায় গাছে কিছু থাক্‌বার যো নেই। যত বদ্ ছেলেকে জুটিয়ে যেন ডাকাতের দল করেছে।" কিন্তু বাবাকে সকলে সম্মান করিত বলিয়া আমার উপদ্রবের কথা বলিয়া কেহ কখনও বাবার কাছে নালিশ করিত না।

বিকাল হইলেই ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া যাইত, বুক কাঁপিত। কেননা সেই সময় সকালে যাহা পড়িতাম বাবা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। জন্মে কখন বাবা প্রহার করেন নাই, কিন্তু পড়া বলিতে না পারিলে তাঁহার মুখে যে

অপ্রসন্ন ভাব দেখিতে পাইতাম তাহা নিষ্ঠুর প্রহার অপেক্ষাও আমার কাছে অধিক যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কদাচিৎ বাবাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে আনন্দ হইত, বড় হইয়া কোনও কৃতকার্য্যতায় সেরূপ আনন্দ অনুভব করি নাই। বিদ্যালঙ্কার দাদা এই সময় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। আমাকে উত্তর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে একটু ইঙ্গিত আভাস দিবার চেষ্টা করিতেন। যেদিন পড়া বলিতে পারিতাম সেদিন বিদ্যালঙ্কার দাদার উল্লাস দেখে কে? বাবাকে বলিতেন "ভবভূতির কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি!" আবার যেদিন আমি একটিও উত্তর দিতে পারিতাম না, সেদিন বিদ্যালঙ্কার দাদা অমনি আমার পক্ষ সমর্থন করিতেন। বাবাকে বুঝাইতেন "এই অল্প বয়স, এর মধ্যে ভবভূতি যা শিখেছে তা ঢের।" পড়া জিজ্ঞাসা হইয়া গেলে সন্ধ্যার সময় শিবালয়ে আরতি দেখিতে যাইতাম। ফিরিতে অন্ধকার হইত। বিদ্যালঙ্কারদাদা সাবধানে আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। পথে কত কথা। দাদা মুখে মুখে আমাকে চাণক্য-শ্লোক শিখাইয়াছিলেন। সেগুলির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। কেবল তাহাদের ছন্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া সেগুল কণ্ঠস্থ কয়িয়াছিলাম।

দাদা পড়িতেন, আমিও পড়িতাম। একদিন দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আচ্ছা দাদা, তোমার পড়া কতদিনে শেষ হবে?" দাদা সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চল তোমার গাড়ী বাহির করে দিই।" কাঠের একখানি ছোট গাড়ী দাদাই আমায় তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম

"আচ্ছা দাদা, আমি যে বই পড়ি তার চেয়ে খুব শক্ত বই বুঝি তুমি পড়, না?" দাদা সংক্ষেপে বলিলেন "হুঁ।" আমার খেলিবার গাড়ী বাহির হইল। দাদা টানিতে লাগিলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমি ও সব কথা শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম।

দাদাকে সকলেই ভালবাসিত। "বিদ্যালঙ্কার, আমার সঙ্গে চল না" বলিলেই দাদা অমনি তাহার সঙ্গে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিতেন। চতুষ্পাঠীর সমস্ত বন্দোবস্ত, খাদ্যের যোগাড়, হাটবারে হাটে যাওয়া প্রভৃতি কার্য্য বিদ্যালঙ্কার দাদা ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে কেহ ডাকিত "বিদ্যালঙ্কার" অমনি "কি ভাই" বলিয়া দাদা সহাস্যে উত্তর দিতেন।

একবার নূতন একজন ছাত্র আসিয়াছে। শুনিলাম ছাত্রটি খুব মেধাবী। অল্প বয়সেই কাব্য ব্যাকরণ সমগ্র শেষ করিয়া বেদান্ত পড়িতেছে। সে আসিবার দিন দুই পরে একদিন দাদা দপ্তরটি খুলিয়া পুঁথি বাহির করিয়া একজন ছাত্রের নিকট একটি শ্লোক বুঝাইয়া লইতেছেন, এমন সময় সেই নবাগত ছাত্র আসিয়া উদ্ধত স্বরে বলিল "এই যে বিদ্যালঙ্কার, চল, একবার আমার সঙ্গে তোমায় সিউড়ি যেতে হবে!" সিউড়ি আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দাদা বলিলেন, "এই শ্লোকটার মীমাংসা করে যাচ্ছি।" নবাগত ছাত্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "আরে রেখে দাও শ্লোক। বিশ বচ্ছর পড়্ছ—এখনও শিশুপাল বধের প্রথম সর্গের একটা শ্লোক বুঝতে এত কাণ্ড করতে হয়! চল, চল, আমি যেতে

যেতে মুখে মুখে তোমায় সব বুঝিয়ে দেব এখন। কোন্ শ্লোকটা? ও:—

সটাচ্ছটাভিন্নঘনেন বিভ্রতা
নৃসিংহসৈংহীমতনুং তনুং ত্বয়া।

ও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। নাও, ওঠ! আর ছেড়ে ছুড়ে দাও না। কতকাল আর এই কাব্য পড়বে? বয়সও ত নেহাৎ কম হয়নি। তোমার ছেলের বয়সী যারা তারা কাব্য শেষ করে দর্শন পড়ছে।”

দাদা কোনও কথা বলিলেন না। আস্তে আস্তে পুঁথি মুড়িয়া দপ্তরে বাঁধিলেন। চটি পায়ে দিয়া চাদর লইয়া বলিলেন “চল।” আর কেহ দেখিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু আমি দেখিলাম দাদার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। বাবা গাড়ু করিয়া জল লইয়া হাত পা ধুইতেছিলেন। বলিলেন “কি হয়েছে রে?” আমি রোরুদ্যমান স্বরে এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম। বাবা বলিলেন “আচ্ছা, যা। বিদ্যালঙ্কারকে কিছু বলিস নি। সে বড় অভিমানী। মনে বড় কষ্ট পাবে।”

তাহার পরে বাবা কি করিলেন জানিনা, কিন্তু নবাগত ছাত্র আর কখনও দাদাকে কিছু বলিতে সাহস করে নাই। আমার মনে কিন্তু বাবার একটি কথা জাগিয়া রহিল “বিদ্যালঙ্কার বড় অভিমানী।” তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। অনেক কথা ভাবিতে লাগিলাম। দাদা বাবার কাছে পড়িতেন না কেন? নূতন নূতন ছাত্র আসিলে দাদা তাহাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া তাহার কাছেই পড়িতেন। অন্যান্য ছাত্রেরা কি দাদার মনে আঘাত দিত? বাবার কাছে পুনঃ পুনঃ একই শ্লোক

পড়িতে কি দাদার অনিচ্ছা হইত? আকাশ পাতাল কত কি ভাবিলাম, কিছুরই মীমাংসা হইল না।

একদিন বিকালবেলা বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম বাবার বড় অসুখ। আমি দেখিতে যাইতেছিলাম, বিদ্যালঙ্কার দাদা যাইতে দিলেন না, বাহিরে ছাত্রদের কাছে বসিয়া রহিলাম। তাহারাও পীড়ার বিষয়েই কথোপকথন করিতেছিল। একজন বলিল "বিসূচিকা, বড় সাংঘাতিক।" আর একজন বলিল "কবিরাজ মহাশয় ত কোন আশা দেন না।" আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। বড় কান্না পাইতেছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গেল। মা একবারও ডাকিলেন না, বিদ্যালঙ্কার দাদাও আসিলেন না। আমি দু-একবার বাড়ীর ভিতর যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ছাত্রেরা ধরিয়া রাখিল। কত রাত্রি জানিনা, দাদা আসিয়া ডাকিলেন "ভবভূতি এস।" আমি একেবার বাবার ঘরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

শয্যার পাশে মা কাঁদিতেছেন। বাবা শয়ন করিয়া আছেন। বাবা বলিলেন, "ভবভূতি এসেছিস্। বিদ্যালঙ্কারের কথা শুনে চলিস্। কখনও অবাধ্য হস্নি। বিদ্যালঙ্কার, তোমায় আর কি বল্ব? আমার বংশের মর্য্যাদা আজ তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।" মা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। চোখের জলে আমিও কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বাবাকে হারাইলাম। চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেল। ছাত্রগণ সকলেই চলিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপ, ছাত্রদের বৃহৎ আটচালা শূন্য। সমস্ত দিন নীরবতার আধিপত্য। কেবল গেলেন না বিদ্যালঙ্কার দাদা। মা আর সংসারের কিছুই দেখিতেন না।

সকল বন্দোবস্ত করিতেন বিদ্যালঙ্কার দাদা। আমি চুপ করিয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকিতাম। ফল চুরি করা আর হইত না। নিদাঘের দীর্ঘ দ্বিপ্রহর একাকী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। কত কি ভাবিতাম, মধ্যে মধ্যে বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিতপক্ষ প্রজাপতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতাম। কখনও দূর হইতে বিহঙ্গের কূজনধ্বনি কানে ভাসিয়া আসিত।

দাদা প্রায়ই ব্যস্ত থাকিতেন। বাবার মৃত্যুর পর দাদার সহসা কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ আর নাই। সর্ব্বদা বদন চিন্তাক্লিষ্ট। দাদার দপ্তরটিও আর খোলা হয় না। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, দাদা, সবাই বাড়ী চলে গেল, তুমি কেঁন গেলেনা?" দাদা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমার বাড়ী নেই যে ভাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বাবা নেই, মাঁ নেই?" দাদা অস্পষ্টস্বরে বলিলেন "কেউ নেই।" আমার বুদ্ধি কিছু কিছু হইতেছিল। সহসা চুপ করিলাম। বাবার কথা মনে পড়িল "দাদা বড় অভিমানী।" একথা জিজ্ঞাসা করিয়া হয়ত দাদার মনে কষ্ট দিয়াছি। আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া দাদা বলিলেন "ভবভূতি, চ, ঘোষেদের বাড়ী যাই।" আমি বলিলাম "না।"

বিদ্যালঙ্কার দাদা একদিন মাকে বলিলেন, "ভবভূতিকে আমি নবদ্বীপে নিয়ে যাই। সেখানে টোলে ভবভূতি পড়াশুনা করুক। এখানে থাকলে আর তো কিছু হবে না।" মা কিন্তু সহজে আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন না। চতুষ্পাঠী উঠিয়া যাওয়ার পর মা সংসারের কিছু দেখিতেন না। সমস্ত দিন আমায় চোখে চোখে রাখিতেন। আমিও মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইলাম না।

মাতৃস্নেহের সুশীতল ধারায় আমি প্রাণ ভরিয়া অবগাহন করিতে-ছিলাম। এতদিন তাহা পাই নাই। আজ তাই এ স্নেহ আমার বড় প্রিয়। কিন্তু তবু মাকে সম্মত হইতে হইল, তবু আমায় মাকে ছাড়িতে হইল। "বংশের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে"— বিদ্যালঙ্কার দাদার এ কথা কাটান যায় না।

শেষে একদিন গাছের ডগায় রৌদ্র পড়িতে না পড়িতে আমি দাদার সঙ্গে গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। দ্বারপথে অর্দ্ধ দৃশ্যমান মাকে দেখিলাম—তাঁহার নয়নে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ দেখিলাম। আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বিদ্যালঙ্কারদাদা আমার চোখ মুছাইয়া দিলেন। মাঠে কৃষাণ লাঙ্গল দিতেছে দেখাইলেন, ধানের গোলা দেখাইলেন, বৃহৎ শকুনি উড়িতেছে দেখাইলেন। আমি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। কান্না তখন থামিয়া গিয়াছে। কেবল এক একবার রুদ্ধ শোক সমস্ত দেহখানিকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপকের গৃহে স্থান পাইলাম। তিনি আমার পিতার সুপ্রসিদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার দাদাও এই টোলের একজন ছাত্র হইলেন। কিন্তু দাদার বিমর্ষভাব আর ঘুচিল না। পড়াশুনাতেও আর দাদার সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাইতাম না। বৃহৎ আটচালায় ছাত্রদের পাঠের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে দাদা বসিয়া থাকিতেন, সামনে পুঁথিও খোলা থাকিত, কিন্তু দাদার চোখ সেদিকে থাকিত না। আমাকেও যেন এই সময় কিসে পাইয়াছিল। পড়াশুনায় আগে হইতে খুব অল্পই উৎসাহ ছিল। এখানে আসিয়া এক রকম উৎসাহের লোপ হইল বলিলেই হয়। নবদ্বীপে আমার

সমবয়সী বহু দুরন্ত বালকের সহিত আমার সদ্ভাব হইল। আমাদের উপদ্রবে গ্রামখানি সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

গঙ্গাতীরে মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া চাল ডাল সংগ্রহে বাজার গিয়াছে, একজন দাঁড়ী নৌকার ভিতর বসিয়া গুন গুন করিয়া গান করিতেছে, হঠাৎ আমাদের বালকের দল গিয়া নৌকার কাছি কাটিয়া দিল। স্রোতে নৌকা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দাঁড়ীর চীৎকারের সহিত আমাদের উচ্চহাস্য নদীর কূলে কূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কামারগিন্নি কলসী কক্ষে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। 'টং' করিয়া কোথা হইতে এক-খণ্ড ইষ্টক কলসীর উপর আসিয়া পড়িল। কামারগিন্নির অজস্রগালি আমরা মহানন্দে শ্রবণ করিতে লাগিলাম ও লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে বলিয়া গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

বৃদ্ধ ঘোষজা মহাশয় বড় ভূতের ভয় করিতেন। সন্ধ্যার পর লাঠিগাছটি লইয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিতেছেন। একটা বাঁশঝাড়ের নিম্ন দিয়া যাইতে হইবে। দেখিলেন, একটা বাঁশ রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। আমি তখন দড়ি দিয়া প্রাণপণে বাঁশটাকে টানিয়া বাঁধিয়াছি। ঘোষজা মহাশয় আর একটু অগ্রসর হইলেই দড়ি খুলিয়া দিলাম। সটাৎ করিয়া বাঁশটা উপরে উঠিয়া গেল। ঝর্ ঝর্ করিয়া শুকনো পাতায় ঘোষজা মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। আতঙ্কে তিনি তিন হাত পিছাইয়া গেলেন। আমরা আহ্লাদে আত্মহারা।

কাহারও বড় যত্নের কলমের চারার আম্র, অতি সাবধানে রক্ষিত হইত। রাত্রির মধ্যেই তাহা লুণ্ঠিত হইল। কেহ

আমাদের গালি দিয়াছে, তাহার সাধের লাউগাছটির গোড়া ছুরি দিয়া কে কাটিয়া দিয়া গেল। বর্ষাকালে পথিক পথ দিয়া যাইতেছে একস্থানে একটু গর্ত্তে খানিকটা কাদা-মাখা জল জমিয়াছিল। পথিক আসিতেই কোথা হইতে একখানা ইট ঝপ্ করিয়া সেই জলের উপর পড়িল। পথিকের সর্ব্বাঙ্গ কাদায় ভরিয়া গেল।

এইরূপ ভয়ানক উপদ্রব চলিতে লাগিল। সাহসে ও বলে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম। তা ছাড়া নূতন নূতন দুষ্টামির বুদ্ধি আমার মাথায় যেরূপ খেলিত সেরূপ আর কাহারও হইত না, কাজেই আমি ছিলাম দলপতি।

এখানে আমার গুরুদেবের কাছে আমার নামে প্রায়ই নালিশ পৌঁছিত। তিনিও অতিশয় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। কেহ আসিয়া নালিশ করিলেই আমাকে কঠোর তিরস্কার ও সময় সময় চড়টা চাপড়টাও দিতেন। কিন্তু তাহাতে ফল এই হইত যে যাহার জন্য আমি তিরস্কার বা প্রহার সহ্য করিতাম প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার উপর আমার অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিতাম।

বিদ্যালঙ্কার দাদা সস্নেহে অনেকবার আমায় নিষেধ করিতেন। আমি শুনিতাম না। কেহ নালিশ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন, গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। যদি কেহ নিতান্তই তাঁহার কথা না শুনিত, তাহা হইলে তিনি গুরুদেবের কাছে গিয়া আমার দোষক্ষালনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেন। মিথ্যা কথা পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত

হইতেন না। ইহাতে আরও আমার সাহস বাড়িতে লাগিল।

সরস্বতী পূজা আসিল। আমাদের টোলে পূজা। ছেলের দলে মহা উল্লাস। ফুল সংগ্রহের ভার আমি গ্রহণ করিলাম। ছেলেদের দলে প্রচার করিয়া দিলাম ডাক্তার সাহেবের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিব।

সাহেবের বাগানে অতি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিত। আমাদের মনে অনেকদিন হইতে উহা সংগ্রহ করিবার স্পৃহা জাগিতেছিল। কিন্তু সাহেব বড় রাগী বলিয়া কেহ সাহস করিয়া সে বাগানে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। কাজেই আমি যখন ছেলেদের কাছে এ প্রস্তাব করিলাম, তখন তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুই একজন নিষেধও করিল। কিন্তু আমি বলিলাম যে আমি একাই যাইব। কাহারও সাহায্যে প্রয়োজন নাই। তখন তাহারা আমার সাহসে বিস্মিত হইয়া রহিল। ঠিক করিলাম ভোর না হইতেই ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিব।

সন্ধ্যার পর শয়ন করিলাম, কাহাকেও কিছু বলিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ভোর হইবার পূর্ব্বেই উঠিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না। একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম ঘর অন্ধকার। পাশের ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। গুরুদেব ও বিদ্যালঙ্কার দাদার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। আমার বড় কৌতূহল হইল। পা টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

বিদ্যালঙ্কার দাদা বলিতেছেন, "এবারকার মত ভবভূতিকে

মাপ করুন। ছেলে মানুষ, এখনও বুদ্ধি হয় নি। না হলে’ আর এমন উপদ্রব করে? আমি জেলেনীকে তার সমস্ত মাছের দাম চুকিয়ে দেব।”

সেদিন সকালে এক জেলেনীর মাছের চুপড়ী উল্‌টাইয়া দিয়াছিলাম। বুঝিলাম সে নালিশ করিয়াছে।

গুরুদেব বলিলেন, “দেখ বিদ্যালঙ্কার, তুমি এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরে যাও, তা না হলে ভবভূতির ভাল হবে না। আমি তাকে শাসন করতে চাই, তোমার আদরে সে শাসনের ফল হয় না। তুমি চলে গেলে ও নিশ্চয়ই ভাল হবে।”

দাদা বলিলেন “দেখুন, ছেলেবেলা থেকে ওকে বড় ভালবাসি। ওকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না। আর ও শুধরে যাবে। আপনি ওকে বেশী কিছু বল্‌বেন না। আহা এই বয়সেই পিতৃহীন। ওর বাপ বেঁচে থাক্‌লে আজ ওর ভাবনা কি?”

গুরুদেব বলিলেন, “বিদ্যালঙ্কার, তুমি আমায় কি মনে কর? ভবভূতির বাপ আমার কতদূর আপনার ছিল তা কি তুমি জান? আমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না। আমি ভবভূতির পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করি। আমি কি ভবভূতিকে অযত্ন করি? আমার সমস্ত কাজ একদিকে, ভবভূতি একদিকে। কেবল মুখে শাসন বৈত নয়। তুমি থাক্‌লে ভবভূতি অন্যায় আদর পাবে। সেই জন্যই তোমায় তফাতে যেতে আমার অনুরোধ।

দাদা গুরুদেবের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, "আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। আমি কালই চলে যাব। ভবভূতিকে বল্‌বেন আমি তীর্থে গেছি। তার সঙ্গে আর দেখা কর্‌বো না। আজ রাত থাক্‌তে থাক্‌তে আমি চলে যাব।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিয়া গুরুদেব ও দাদার পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "দাদা তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। আমি আজ থেকে আর কোন উপদ্রব কর্‌বো না প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি। আমায় বিশ্বাস কর।"

দাদা আমার চোখ মুছাইয়া দিলেন। গুরুদেব সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভয় কি? বিদ্যালঙ্কার কোথা যাবে? শোওগে যাও।"

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার দাদাকে বলিতে লাগিলাম "দাদা, আমায় ছেড়ে যেওনা।" দাদা বলিলেন "পাগল নাকি! আমি কোথা যাব?"

কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। একবার রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল ফুল আনিতে হইবে যে! কাল সরস্বতী পূজা। ছেলেদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজ সাহেবের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিব। তখন গুরুদেব ও দাদার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাও মনে পড়িল। একবার ভাবিলাম আর ফুল তুলিতে যাইব না। আজ হইতে আর কোন দুষ্টামি করিব না। আবার ভাবিলাম ছেলেরা তাহা হইলে কি বলিবে? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে

ভয়ে আমি ফুল আনিতে সাহস করি নাই। না—ফুল আনিতেই হইবে। কাল ছেলেদের ফুল দেখাইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিব যে আমার দ্বারা আর কোনও উপদ্রব হইবে না।

এই সঙ্কল্প করিয়া ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম। তখন কত রাত্রি জানি না। আকাশ-ভরা তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। শীতকাল, খুব ঠাণ্ডা বাতাসে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। র‍্যাপারখানি গায়ে জড়াইয়া সাহেবের বাগানের দিকে দ্রুতবেগে চলিলাম।

সাহেবের বাগানের ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। প্রাচীর বেশী উঁচু নয়। বাগানের মাঝখানে একটি ছোট বাঙ্গলা। চারিদিক নিস্তব্ধ। সকলেই ঘুমাইতেছে। আমি প্রাচীরে উঠিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িলাম।

ঘড়্ ঘড়্ করিয়া কতকগুলি টিন্ নড়িয়া উঠিল। রান্না-ঘরের ছাউনির জন্য সাহেব টিন্ আনাইয়াছিলেন। লাফাইতে গিয়া তাহার উপরই পড়িয়াছি। পায়ে দারুণ আঘাত লাগিল। অতি কষ্টে দুই এক পা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা চাঁপাগাছের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। কুকুরটা ছুটিয়া আসিল। তীব্রকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। পিছন দিকে ঝপ্ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কুকুরের ভয়ে আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। কুকুরটা গাছের গোড়ায় দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে ডাকিতে লাগিল।

কে একজন সাদা কাপড় গায়ে গাছের দিকে আসিল। বাড়ীর একটি জানালা খুলিয়া গেল। সাহেব হাঁকিলেন

"কোন্ হ্যায়?" বাগানের অপর প্রান্ত হইতে কে বলিল "হুজুর, ডাকু হোগা।"

গাছের নিম্নে যে আসিয়াছিল সে বলিল, "ভবভূতি, পালিয়ে আয়।" কি সর্ব্বনাশ! এ যে বিদ্যালঙ্কার দাদা। কুকুরটা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সহসা গুড়ুম করিয়া বন্দুকে শব্দ হইল। বিদ্যালঙ্কার দাদা পড়িয়া গেলেন। আমি গাছ হইতে লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কুকুরটা ক্ষিপ্তভাবে ডাকিতে লাগিল।

আলো লইয়া সাহেব, চাপরাসী প্রভৃতি আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দাদা বলিলেন, "ভবভূতি, আর এরকম করিস্‌নি। আমায় মনে রাখিস্। বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিস্।"

সেই মুহূর্ত্তে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন—সেই মুহূর্ত্তে দাদার জীবনশূন্য দেহ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম জীবনে আর ফুল স্পর্শ করিব না। দাদার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছি। এতে আমার অখ্যাতি হয় হোক্—সর্ব্বনাশ হয় হোক—

ছাত্রেরা আর বলিতে দিল না। নৃপেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়, আমাকে মাপ করুন। আমি নরাধম।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্নেহে নৃপেনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "রাত হয়েছে। বাড়ী যাও।"

নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?"

বরদা ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল। একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুক্‌রা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদনমধ্যে প্রেরণপূর্ব্বক আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া একটু রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপূর্ব্বক অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বন কার্য্য সমাপন করিল। পরে একটুকু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল "ভূত! না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "Rather Loconic". সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল; অতএব সহসা উত্তর করিল না।

যথাবিহিত সময়ে, অবসরপ্রাপনান্তর সে বলিল, "Loconic? বরং একটি কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে 'ভূত আছে?' আমি বলিলেই হইত 'না।' আমি বলিয়াছি

'ভূত? না।' 'ভূত' কথাটি বেশী বলিয়াছি, কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।"

এই বলিয়া আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিল। সারদা অবিচলিতচিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল, তখন বরদা বলিল, "Seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না?"

সারি। না।

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না?

সারদা। সেই প্রাচীন ঋষির কথা—"প্রমাণাভাবাৎ।" কপিল প্রমাণ অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না, আর আমি প্রমাণ অভাবে ভূত মানিব?

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সংকারার্থ আপনার উদরমধ্যে প্রেরণ করিল।

বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল—বলিল "কোথাকার বাঁদর? ভূত নাই! ঈশ্বর নাই! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই!"

সারি। তাই বটে। তোমার মটন রোষ্ট ফুরাইল দেখিয়া আমি নেই। আর আমার আহারের ঘটা দেখিয়া বোধ হয় তুমিও নেই।

বরদা। "কই, থেলি কই?" এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংস-টুকু কাটিয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত করিয়া গ্লাসে শেরি ঢালিয়া দিল। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বিন্ধন, মুখে উত্তোলন এবং চর্ব্বণ ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ততক্ষণ বরদা

চুপ করিয়া রহিল। পরে অবসর পাইলে সারদা জ্যেষ্ঠকে বলিল,

"তুমি নাই আর আমি নাই, ইহা প্রায় philosophically true. কেননা আমরা permanent possibilities of sensation. আর এই যে আহার করিলাম, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে। কেবল সেই possible sensation গুলার মধ্যে কতকগুলা sensation হইল মাত্র।

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা, এ সব possible sensation নহে?

সারদা। ভূত থাকিলে possible.

বর। ভূত নাই?

সার। তা ঠিক বলিতেছি না—তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।

বর। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে?

সার। আমি কখনও ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।

বর। টেম্‌স্ নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

সার। না।

বর। টেম্‌স্ নদী আছে মান?

সার। যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় এমন অনেক লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বর। ভূতও এমন লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সার। বিশ্বাসযোগ্য এমন কে? একজনের নাম কর দেখি।

বর। মনে কর আমি।

এই কথা বলিতে বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সার। তুমি!

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর

সার। তুমি একটু imaginative, একটু sentimental—রজ্জুকে সর্পভ্রম হইতে পারে।

বর। তুমি দেখিবে?

সার। দেখিব না কেন?

বর। আচ্ছা, তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।

সার। কিন্তু জেনে রেখ আমি একবার ঠেকে শিখেছি। আগে আমারও যে একটু আধটু ভূতের ভয় না ছিল তা নয়। কিন্তু একটা ঘটনায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ও সব রজ্জুতে সর্পভ্রম imaginative লোকেদেরই ঘটিয়া থাকে।

বর। কি ঘটনাটা আগে শুনি। তারপর আমি তোমায় ভূত দেখাব।

সার। আমি একবার ভূত দেখেছিলাম। সেই থেকে ভূত আছে বলে বিশ্বাস করি না।

বর। কি রকম? ভূত দেখে ভূতের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দিহান! নূতন ধরণের কথা বটে।

সারি। ব্যাপারটা শুনলে সব বুঝতে পারবে। আগে খাওয়াটা শেষ হোক্। তারপর সব বল্‌ছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই ভ্রাতা ভোজন সমাপন করিয়া বারান্দায় দুইখানি কঞ্চির চেয়ারে আসীন হইলেন। সুগন্ধি সিগারেট

ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বরদা বলিল 'বল, সারি, তোমাব ভূত দেখার কথাটা শোনা যাক্।"

তখন চারিদিক রজনীর অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছিল। বারান্দার কিনারায় গোটাকতক টবে বিলাতি ফুলের গাছ সজ্জিত ছিল। মধ্যে মধ্যে বাতাস আসিয়া তাহার ডালপালা-গুলি নড়াইতেছিল। তখনও চাঁদ উঠে নাই। তারাগুলি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। বারান্দায় আলোক ছিল না। অন্ধকারে দুই ভ্রাতার মুখে স্থিত দুইটি চুরুটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতে-ছিল।

সারদা বলিল, "তখন তুমি বিলাতে ডাক্তারি পড়িতে গিয়াছ। আমি সেবার ধারমঠের ব্রিজ নির্ম্মাণ করিয়া বেশ কিছু টাকা হাতাইয়াছিলাম। জানই ত, সোনার বেনে আমরা, আমাদের কাছে যে কেউ চালাকি করে ঠকিয়ে যাবেন, তা হতেই পারে না। কণ্ট্রাক্টর হতে কুলি পর্য্যন্ত সকলে জান্ত যে এ বাবুর কাছে চালাকি চলবে না। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি দু পয়সা রোজগার কর্তে, দানখয়রাত কর্তে ত আর নয়। কাজেই যাতে বেশ মোটা রকমের কিছু টাকা হাতান যায়, সর্ব্বদা সেই মতলব করতুম। পোলটা তৈরি করে বেশ দুপয়সা করে নিয়েছিলুম।"

বরদা বলিল, "সারি! তুমি যে পয়সা কর্বে তা আর আশ্চর্য্য কি? তোমার মাথায় যে সব ফন্দী খেলে তা বড় বড় ব্যারিষ্টারদের বুঝতে গলদ্ঘর্ম্ম হতে হয়। সেই বাড়ীর মাম্লা মনে কর—"

সারদা বলিল "একবার কিন্তু জীবনে আমাকে ঠক্তে

হয়েছিল। সে লোকটা আমার ওপর যায়। উদ্দেশে তাকে প্রণাম করি। সে ছাড়া আর কেউ আমাকে জব্দ করতে পারে নি।

বর। তোমাকে জব্দ! সে কি? বল, বল এই গল্পটাই আগে শুনি।

সার। ভুতের কথা আর এই গল্প একই। শোন না। শুন্‌লে সব বুঝতে পারবে।

বর। বল। দিয়াশালাইটা দাও, আর একটা চুরুট ধরাই। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বরদা দিয়াশালাই লইল ও চুরুট ধরাইতে মনোনিবেশ করিল। সারদা গল্প আরম্ভ করিল—

ব্রিজের টাকাগুলো পেয়ে মনে করলুম এগুলো ব্যাঙ্কে রাখা হবে না। খাটিয়ে কিছু বাড়াতে হবে। তখন মধুপুরের কাছে একটা নূতন সহর প্রতিষ্ঠা হচ্চে। অনেক বড় লোক স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য এই মনোরম স্থানটিতে বাড়ী-ঘর তৈরি করতে আরম্ভ করেছেন। আমারও খেয়াল হইল, একটা বড় বাড়ী তৈরি করে ভাড়া দেবো। বাড়ী একখানা হবে বটে, কিন্তু সেটাকে এমন ভাবে তৈরি করা হবে যে সাত আটখানা আলাদা আলাদা বাড়ী তা থেকে করে নেওয়া যাবে। প্রত্যেক বাড়ীর আলাদা কপাট, আলাদা সব। নিজেই ত বাড়ীটার নক্সা করে ফেললুম। সব ঠিক্ করে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।"

বর। জমী ঠিক করবার আগেই বাড়ীর নক্সা তৈরি হয়ে গেল?

সার। শোন, সেই জন্যই ত গোল হল। সেখানে গিয়ে সুবিধামত জমী আর পাই না। পাহাড়ের উপর বেশ সুন্দর খানিকটা জমী ছিল। তা সেটা সেখানকার একজন লোক আগে থাক্‌তেই কিনে রেখেছে। সে জমী কিছুতেই বেচ্‌তে রাজী নয়। আমি ভাবলুম, আমি শ্রীসারদাকৃষ্ণ সেন ইঞ্জিনিয়ার—আমার সঙ্গে চালাকি? তাকে বললুম, 'আচ্ছা, তুমি জমী বেচ্‌তে না চাও, বিশ বছরের মত ঐ জমী আমায় লিজ্‌ (Lease) দাও। লোকটা তাতেও কিছুতে রাজী হতে চায় না। তখন আমার নক্‌সাখানি তার সামনে খুলে ধরলুম। বল্লুম 'ওহে বাপু, এই এত বড় একখানি বাড়ী তৈরি হবে। বিশ বছর আমি ভোগ কর্‌ব, তারপর জমীও তোমার হবে, বাড়ীও। রাজী হও ত বল।'

লোকটা খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে, 'কাল আপনাকে জানাব।' আমি বুঝলুম টোপ গিলেছে। একটু খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। গম্ভীরভাবে 'আচ্ছা' বলে চলে এলুম। তার পরদিন রীতিমত রেজেষ্ট্রী করে লীজ্‌ নিলুম। বাড়ী তৈরি হতে লাগ্‌ল।

বুঝতেই পাচ্ছ সারদাকৃষ্ণ সেন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী তৈরি হচ্ছে। তা আবার লীজ্‌ নেওয়া জমীর উপর। বিশ বচ্ছর বাদে তা অন্য লোকের সম্পত্তি হবে। সে বাড়ীতে নিজে থাক্‌ব না—ভাড়াটে বসবে। এই হিসাবে বাড়ী তৈরি হতে লাগ্‌ল। যত রকম ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, যত কম পয়সা খরচ হতে পারে, সেই রকমে বাড়ীখানি তৈরি করা গেল। বাড়ীর বাইরেটাতে নীল রঙ দিয়ে দেওয়া হল। সামনে একটু রাস্তা। দূর থেকে দেখ্‌তে যেন ছবিখানি।

যে লোকটার জমী সে ত আর আহ্লাদে বাঁচে না। ত্নবেলা এসে দেখে দেখে যায়। মনে মনে ভাবে, 'বিশ বছর বাদে এ বাড়ী আমার হবে।' আমি তার দিকে চেয়ে মনে মনে হাসি আর বলি "বাবা, সারদাকৃষ্ণের বাড়ী ভোগ করবে এমন লোক এখনও ত্নুনিয়ায় জন্মায় নি। বিশবচ্ছর দূরের কথা, পনের বচ্ছর বাদে এ বাড়ীর একখানা ইটও থাকবে না।"

বরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা মালমসলা দিয়ে বাড়ীখানি তৈরি করেছিলে ত?"

সার। তা করব না? আমরা ঐ কাজ করে পেকে গেলুম, আর একবেটা ঝুঁটিওয়ালা একটু জমি লীজ্ দিয়ে ঠকিয়ে একখানা বাড়ী নেবে? বাড়ী ত তৈরি হল। চারদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল,—মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসোপযোগী আট-খানি বাড়ী পাশাপাশি ভাড়া দেওয়া হবে। কেউ ইচ্ছা করলে ত্নখানি বা তিনখানি একত্রে ভাড়া নিতে পারেন। নূতন বাড়ী, স্বাস্থ্যকর স্থান প্রভৃতি প্রলোভন যতদূর দেখাবার তা দেখান গেল। বিজ্ঞাপনের খুব ফলও হল। ত্নু মাসের মধ্যে সব বাড়ীগুলি ভাড়া হয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত।

ত্নবছর এই রকম করে কেটে গেল। বাড়ীগুলি থেকে বেশ আয় হতে লাগ্‌ল। যে বেটার জমী সে কেবল টাঁক্‌ছে কতদিনে বাড়ী তার হয়। আমি মনে মনে হাস্‌ছি আর বল্‌ছি, 'তোমার আক্কেল দাঁত গজিয়ে তবে ছাড়্‌ব।'

তৃতীয় বৎসরের প্রথমে মাঝের একখানি বাড়ী ছাড়া আর সবগুলি এক seasonএর জন্য ভাড়া হয়ে গেল।

মাঝেরটির আর ভাড়াটে জুটছে না। এই সময় আমাকে ম্যালেরিয়া ধরল। আমি মনে করলুম, যাই কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একবার ঐখানেই হাওয়াটা বদ্‌লে আসি। দরখাস্ত করে তিন মাসের ছুটি নিলুম। রওনা হবার যোগাড় কচ্ছি এমন সময় আমার সরকারের এক চিঠি পেলুম যে মাঝের বাড়ীখানি সেইদিন ভাড়া হয়ে গেছে।

আমি সরকারকে টেলিগ্রাম কর্‌লুম সে যেন আমার জন্য আর একখানি বাড়ী দেখে রাখে। দুইদিন বাদে আমি সেখানে গিয়ে পৌছিলুম। সরকার আমার জন্য একখানা ছোট বাড়ী ঠিক্ করে রেখেছিল। সেই খানেই ওঠা গেল।

মাঝের বাড়ীর ভাড়াটের কথা সরকারকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে বল্লে, মশাই বড় বিপদে পড়েছি। যে বেটা মাঝের বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে সে নানা রকম ফ্যাসাদ আরম্ভ করেছে। এটা সারিয়ে দাও, ওটা সারিয়ে দাও। বেটা যেন মেটেবুরুজের নবাব। অমন নতুন বাড়ী পছন্দ হয় না। বেটার দেশের বাড়ী হয় ত খোলার চাল, এখানে এসে আমিরী দেখাচ্ছে।”

আমি বলিলাম, ‘অগ্রিম এক season এর ভাড়া নিয়েছ ত?’

সরকার বলিল, ‘আজ্ঞে, তা না নিয়ে কি আর বেটাকে বাড়ী ঢুকতে দিই? ছ’মাসের ভাড়া আগাম নিয়েছি। আর দুই বচ্ছরের এগ্রিমেণ্ট। তাই জন্যে আরও বেটার রোখ্। বলে, আগাম ভাড়া নিয়েছ, বাড়ী মেরামত করবে না কেন?’

আমি বুঝিলাম দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এর মধ্যেই আমার ইঞ্জিনিয়ারি বুদ্ধিতে প্রস্তুত বাড়ী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। বলিলাম, ‘আচ্ছা, তা দেখা যাবে।’

সরকার বলিল, 'আজ্ঞে, সে এখনই আপনার কাছে আস্‌বে। বলেছে, বাবু আস্‌ছেন, তাঁর সঙ্গেই সব কথা ঠিক্ করব। তুমি সরকার—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে আর কি হবে?' আমি বলিলাম 'আচ্ছা।' সরকার চলিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। দীর্ঘশ্মশ্রু, চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে এক কোঁৎকা। আমায় দেখিয়া বলিল, 'আপনি সারদা বাবু? ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। আপনার বাড়ীটি নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আপনাকে এর একটা বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।'

আমি বুঝিলাম এ সেই বেটা ভাড়াটে। বলিলাম, 'সে কি কথা? নিশ্চয়ই কর্‌ব। আপনাদের সন্তুষ্ট না রাখ্‌লে আমার চল্‌বে কি করে? আপনাদের অনুগ্রহেই ত খাচ্ছি।'

লোকটা বলিল, 'বিলক্ষণ! সে কি কথা! আপনি মহাশয় লোক। আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি না দেখ্‌লে আমাদের দেখ্‌বে কে?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

সে বলিল, 'আমি একা।'

'একা! রান্নাবান্না কে করে?'

'নিজেই।'

আমি স্তম্ভিত হইলাম। বেটা বলে কি? এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে এসেছে। নিজে রেঁধে খায়! ভাবিলাম বোধ হয় কোন রোগী শীঘ্র আসিবে। বলিলাম, 'কার জন্য বাড়ী নিয়েছেন?'

'আমারই জন্য। আমার স্বাস্থ্য ভাল না। একটু স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে আসিয়াছি।'

আমি ত অবাক্। এই ভীম শরীর—এর উপর আবার স্বাস্থ্যোন্নতি? বেটা কি রামমূর্ত্তির খেলা দেখাবে নাকি? মুখে বলিলাম, 'ওঃ। তা আপনার অভিযোগ কি?'

'দেখুন, ঘরগুলির ছাদ ত সব ফুটো হয়ে গেছে। কাল রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, ত শোবার ঘর খানিতে খাটিয়া টেনে টেনেই অস্থির। যেখানে খাটিয়া সরাই সেইখানেই টপ টপ করে জল পড়ে। শেষে খাটিয়ার উপরে ছাতা খুলে সারারাত বসে কাটিয়েছি।

আমার এত হাসি পাইতেছিল যে বুঝি পেট ফাটিয়া যায়। অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলাম, 'বলেন কি? সরকারটা দেখ্‌ছি কোনও কাজের নয়। আমি আজই মিস্ত্রী পাঠিয়ে সব ঠিক্ করে দেব।'

'আর দেখুন, দেওয়াল থেকে চূণ সব খসে পড়্‌ছে। সে গুলোও মেরামত করে দিতে হবে। আর কপাট জানালাগুলো বন্ধ করলেও তার মাঝে এমন ফাঁক থাকে যে, তা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢোকে; আর রান্নাঘরে জল চলবার যে নর্দ্দমা আছে তাতে জল ঢাললে জল আট্‌কে থাকে, সেটাকে একটু বড় করে দিতে হবে; আর ছাতের পাইপটা দু তিন যায়গা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে—আর—'

সর্ব্বনাশ! লোকটার বক্তৃতা মাসিক পত্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের ন্যায় অবিরাম চল্‌ছে যে। বলিলাম, 'সব ঠিক্ করে দেব। আমি আজই মিস্ত্রী পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা যা দরকার

তাদের বলবেন। তারা ঠিক করে দেবে। আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না।' এই বলিয়া লাঠিটা লইয়া জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

লোকটা কি তবু ছাড়ে? সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বলিল, 'যে আজ্ঞে, আপনি মহাশয় ব্যক্তি। আপনার আশ্রয়ে আছি, আপনি'—। আমি বলিলাম 'আপনি কোন্ দিকে যাবেন?' সে একটা রাস্তা দেখাইয়া বলিল 'এই দিকে।'

আমি তাহার বিপরীত একটি গলির দিকে গিয়া বলিলাম 'আচ্ছা, আসুন তাহলে, প্রণাম। আমার এইদিকে একটু কাজ আছে।'

তখন বেটা বিদায় হয়। বাপ্! হাঁফ ছাড়িয়া তখন ঘরে আসিয়া জুতা খুলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমার নির্দ্দেশক্রমে সরকার দু'জন মিস্ত্রী পাঠাইল। তাহারা কেবল ছাদ মেরামত করিয়া দিয়া আসিবে এই বলিয়া দেওয়া হইল। গোবর ও চূণ মিশাইয়া ছাদের উপর একটা কোটিং (coating) দিবে। ছাদ খোঁড়া হইবে না। বর্ষাকালটা এই রকমে রিপু করিয়া চলুক। শীত গ্রীষ্মে কোন ভয় নাই। আস্‌ছে বছর বর্ষাকালে যা হয় দেখা যাইবে।

তার পর দিন বেটা আবার আসিয়া হাজির। বলিল মিস্ত্রীরা কিছুই করে নাই। তাহার কথা শোনে নাই। ছাদে গোবর ঢালিয়া কি একটা কাণ্ড করিয়াছে। মেরামত প্রভৃতি কিছুই হয় নাই।

আমি তখন নিজমূর্ত্তি ধরিলাম। সমস্ত Season এর ভাড়া অগ্রিম আদায় হইয়া গিয়াছে। বেটা করিবে কি? বলিলাম,

'আবার কি হবে? গোটা বড়ীটা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে দিতে হবে নাকি? তুমি কোথাকার লোক? বাড়ী যখন ভাড়া করেছিলে তখন দেখে নিতে পারনি? নানা রকম ফ্যাচাঙ্ বার করে উদ্বাস্ত করে তুলেছ।'

'আজ্ঞে, দোর জানালা বন্ধ কল্লেও কপাটের ভিতর দিয়ে ফাঁক রয়, হু হু করে হাওয়া ঢোকে।'

তা ঢুকবেই ত। এসেছ হাওয়া বদলাতে—হাওয়া খাবে না? ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে বাড়ী তৈরি হয়েছে; ventilation না থাকলে সে বাড়ী বাসযোগ্যই নয়, তা জান? থাক পাড়াগাঁয়ে, এ সব বুঝ্বে কি?'

'আর রান্নাঘরে যে নর্দ্দমা দিয়ে জল বেরোয় না।'

'সেখানে জল ঢাল কেন? একটা মাটির গাম্লা কেনো, তাতে জল ঢাল; গাম্লা ভর্ত্তি হলে বাড়ীর বাহিরে গাম্লা নিয়ে গিয়ে জলটা ফেলে দিলেই হবে।'

'আর বালি চুণ খসে পড়ছে যে—'

'তোমার বায়নাক্কা ত কম নয়? দেবে ত মাসে ত্রিশ টাকা ভাড়া। তা ইটবারকরা দেওয়াল হলে তোমার ঘুম হয় না। কি এমন নবাব পুত্তুর তুমি যে তোমার জন্যে ঘরে পেণ্ট্ করে দিতে হবে? আর কিছু হবে টবে না। মিছামিছি আর জ্বালিও না। পছন্দ না হয় অন্য বাড়ী খুঁজে নাও গে।'

'আজ্ঞে তা হলে আমি বাড়ীই বদলাব।'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আমার টাকা তাহলে ফেরত দিন।'

'কিসের টাকা ?'

'আমি যে ছ'মাসের ভাড়া আগাম দিয়েছি।'

'সে টাকা কেন দেব? আমি ত আর তোমায় উঠিয়ে দিচ্ছি না। তোমার পোষাচ্ছে না—তুমি উঠে যাচ্ছ।'

'আজ্ঞে, আপনি আইনতঃ বাড়ী মেরামত করতে বাধ্য।'

'বেশ, আদালতে নালিশ করগে যাও। এই গলির মোড়েই শ্যামাচরণবাবু উকিল থাকে। যাও তাঁর কাছে। দেখ, কি করতে পার।' বেটা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমিও শীষ্ দিতে দিতে বাবুর্চ্চিকে ফাউল কারির অর্ডার দিলাম। তারপর দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। শুনিলাম লোকটার ভারি পসার। কাহাকেও মাদুলি দিতেছে, কাহারও বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম ব্যাটা আমার কাছে জব্দ হয়ে গেছে।

চার পাঁচদিন পরে একদিন সকাল বেলা চা বিস্কুট খাইতেছি এমন সময় আমার বাড়ীর ভাড়াটিয়া তিন চারজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখের ভাব উদ্বেগব্যঞ্জক। আমি তাঁহাদিগকে খাতির করিয়া বসাইলাম। তাঁহাদের মধ্যে অবিনাশবাবু বয়সে প্রবীণ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি ?

অবিনাশবাবু বলিলেন 'মশাই, আমাদের সবাইকে ত আপনার বাড়ীগুলি ছাড়তে হ'ল।

'কেন ?'

'আজ্ঞে, এতদিন বেশ ছিলুম, কিন্তু দিন দুই তিন হতে বাড়ীগুলিতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে।'

আমি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'ভূত! বলেন কি মশায়? তামাসা কচ্ছেন নাকি?'

'আজ্ঞে না, তামাসা কি? প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমার ছোট মেয়েটির হাঁপানির ব্যারাম। এখানে সারতে এনেছিলুম। দুর্ব্বল শরীর। ভূত দেখে তার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে। গিরীনবাবুর পরিবার ত মাথার দিব্য দিয়ে বলেছিলেন আজই বাড়ী ছাড়্তে হবে। ছেলেপুলে সব ভয়ে কাঁটা।'

আমি ভাবিলাম সেই বেটার কারচুপি। বলিলাম, 'কি হয়েছিল খুলে বলুন দেখি। কোথায় ভূত বেরুল?

'আজ্ঞে, কোথায় তা কি ঠিক আছে? কখনও আমার বাড়ীর ছাদে, কখনও গিরীনবাবুর ছাদে। কখনও, কোথাও কিছু দেখা যায় না, বিকট হাসির শব্দ। কখনও মেয়েলি গলার গান। সে ভয়ানক ব্যাপার!'

'দেখুন, এ সব সেই নতুন ভাড়াটে বেটার বদমায়েসি। নইলে ভূত কোথা থেকে আসবে? এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না, আর সেই বেটা আসতেই ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হল! আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্। আমি বেটাকে সিধে করে দিচ্ছি।'

'আপনি বলেন কি? তিনি ত ভূতের একজন বিখ্যাত ওঝা। তিনি যেদিন বাড়ীতে থাকেন সে দিন ত' কোনও উপদ্রবই হয় না। তিনি যেদিন বাড়ীতে না থাকেন সেই দিনই উপদ্রব হয়।'

'তিনি আবার যান কোথায়?'

'তিনি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন। শ্মশানে মশানে যান বোধ হয়।'

আমার আর সহ্য হইল না। বলিলাম, 'দেখুন, আপনারা সব শিক্ষিত লোক। ঐ বুজরুক বেটার কথায় ভোলেন! ভূত টুত কিছু নয়। সব ও বেটার বদমায়েসি। আমি আজই ভূত তাড়াচ্ছি। আপনারা দু' একদিন চুপ করে থাকুন।'

স্থির হইল, আমি সেইদিন অবিনাশবাবুর বাড়ীতে গিয়া রাত্রিতে থাকিব ও স্বচক্ষে ভূতের কাণ্ড দেখিব। সন্ধ্যার পর বাবুর্চ্চি গরম গরম খানা আনিয়া দিল। খাইয়া বেশ একটু অধিক মাত্রায় ব্রাণ্ডি টানিলাম। তারপর স্ফূর্ত্তির সহিত অবিনাশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় দেখিয়া গেলাম, নতুন ভাড়াটে বেটার বাড়ীর দ্বারে বাহির হইতে তালা বন্ধ। শুনিলাম উকিল শ্যামাচরণবাবুর মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়াশান্তির জন্য সে শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত রাত্রি হোম করিবে।

সরকারকে শ্যামাচরণবাবুর বাটিতে পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, বেটা যদি সেখানে না থাকে ত আমায় আসিয়া খবর দিবে। আর যদি থাকে ত সেখানে বসিয়া সারারাত তাহাকে পাহারা দিবে। কোথায় যায় সন্ধান করিবে।

সরকার চলিয়া গেল। আমি অবিনাশবাবুর ছাদে উঠিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গে কেহ থাকিতে স্বীকৃত হইল না। আমি একাকী একখানি চৌকীর উপর বসিয়া রহিলাম।

তখন বর্ষাকাল। আকাশে চন্দ্র, তারকা কিছুই দেখিবার

উপায় নাই। মেঘে সারা আকাশ ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি বেশ করিয়া ওয়াটারপ্রুফে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রহিলাম। আমার বাড়ীগুলির ছাদ একই। কেবল মধ্যে মধ্যে একটা প্রাচীর তুলিয়া বাড়ীগুলিকে পৃথক করা হইয়াছে। আমার পিছনে এইরূপ প্রাচীর। তাহাতে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম। সামনে ছাদের শেষে আবার একটা ঐ রকম প্রাচীর।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। কোনও সাড়াশব্দ নাই। কেবল টপ টপ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতেছিল। কিছু দূরে একটা গাছ ছিল। মাঝে মাঝে দু একটা পাখী বোধ হয় ডানা নাড়িতেছিল। তাহারই ঝট্‌পট্ শব্দ শুনিতেছিলাম।

এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল। কোথাও কিছু নাই। বসিয়া বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। একবার উঠিয়া বেড়াইব বলিয়া দাঁড়াইলাম।

ও কি-ও! খুব মিষ্ট গলায় কে যেন গান গাইতেছে শুনিতে পাইলাম। অতি করুণ বিষাদময় সুর। গানের কথা বুঝিতে পারিলাম না। কোথা হইতে গান আসিতেছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কে যেন গান গাইতেছে ও হাত তালি দিয়া তাল রাখিতেছে। আমি চারিদিকে দেখিলাম, কিছুই দেখা গেল না। একবার বিদ্যুৎ চমকিল। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

খানিকক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ। তখন আমার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। একটু ছাদের উপর বেড়াইলাম। একবার মনে করিলাম—অবিনাশ

বাবুকে ডাকি। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা বোধ হইল। তাঁহারা মনে করিবেন কি?

ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—কতকগুলি উপর্য্যুপরি শব্দ হইল। আমি যে প্রাচীরে ঠেস্ দিয়াছিলাম ঠিক তাহার পিছনেই শব্দ হইল—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্। আমি সাহসে ভর করিয়া চৌকির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরে অপর পার্শ্বে কিসের শব্দ হইতেছে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। মনে হইল শুভ্রবর্ণ কি একটা পদার্থ চলিয়া বেড়াইতেছে। শৃঙ্গের উপর কি একটা উঁচু হইয়া রহিয়াছে।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম 'কে?'

উত্তর নাই। সঙ্গে একখানা ছোরা ছিল, সেইখানা সশব্দে সই পদার্থটার উপর নিক্ষেপ করিলাম। অমনি হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি বিকট হাস্যধ্বনি! আমার রক্ত জল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে নামিয়া পড়িলাম। সেই হাস্যধ্বনি বাড়ীর আর আর সকলে শুনিতে পাইয়াছিল। বোধ হইল নীচে কে যেন মূর্চ্ছা গেল। অস্ফুট গোলমাল হইতে লাগিল। আমি দেখিতে যাইব এমন সময় দশদিক আলোকিত করিয়া একবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত লইল। আতঙ্কে প্রাচীরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, প্রাচীরের উপরে উন্মুক্তকুন্তলা, বিস্রস্ত বসনা এক রমণী মূর্ত্তি। সে একবার হাততালি দিয়া আবার হাসিল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। তাহার পরই বিকট বজ্রধ্বনিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম বাসায় শয়ন করিয়া আছি। পাশে সরকার ও সেই ভাড়াটে বেটা। বেটা বলিল 'বাবু, এখন

কি রকম বোধ কচ্ছেন?” রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। এই ব্যাটার জন্যই ত এত কাণ্ড। কোন উত্তর দিলাম না।

বেটা আবার বলিল ‘বাবু, আপনি ইংরাজি পড়েছেন। ভূত প্রেত ত মানেন না। ভেণ্ট্‌লেসন না পেণ্ট্‌লেসন করতে কবাট জানালা খুলে রাখেন। হাওয়া বহিলেই উপ-বেবতার উপদ্রব হয়। যাক, এখন সামলেছেন ত? আমাদের কাজই হচ্ছে এই হাওয়া নিয়ে। কত অপদেবতা তাড়িয়েছি তার কি সংখ্যা আছে? আপনি ভাববেন না; কিছু দক্ষিণার বন্দোবস্ত হলেই আমি ভূত টুত তাড়িয়ে দেবো।’

আমাকে তখন সামলাইতে হইল। ভূতের ভয় হইলে সব ভাড়াটিয়া ত পলাইবে। হানা বাড়ী বলিয়া প্রচার হইলে ভবিষ্যতে আর ভাড়াটিয়াও জুটিবে না। কাজেই গায়ের রাগ গায়ে মারিয়া বলিলাম, ‘ঠাকুর আপনি মনে করিলে কি না পারেন? এ উপকারটি আপনাকে করিতেই হইবে।’ বেটা বলিল, ‘তার আর কি? আমার বাড়ীটা সারিয়ে দিন, ঐ বাড়ীতে বসে স্বস্ত্যয়ন করব।’

সেই দিনই বাড়ী মেরামত করাইয়া দিলাম। বিকাল বেলা দাঁত বাহির করিয়া বেটা হাজির। বলিল ‘এবার দক্ষিণার বন্দোবস্তটা হলেই—।’ কি করিব? উপায় নাই। বেটা যাহা বলিল, তাহাই করিতে হইল। দুই বৎসরের ভাড়া পাইয়াছি বলিয়া বেটাকে এক রসিদ লিখিয়া দিলাম। রাত্রিতে স্বস্ত্যয়ন ও ভূত শান্তি হইবে।

তৎপর দিন সকালে অবিনাশবাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া

হাজির। বলিলেন, যা হোক খুব ভয়টি পেয়েছিলেন। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আমরাও কি আগে জানতুম? তা হলে কি এত ভয় পাই?'

'কি জান্‌তেন না?'

'আপনি এখনও শোনেন নি? নূতন ভাড়াটে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক পাগলী পরিবার আছে। সে ঐ রকম হাস্‌ত, গান গাইত। মই নিয়ে ছাদে উঠত। কেউ ভাড়াটে রাখে না বলে পরিবারের কথা প্রকাশ করে নাই। নিজে যখন থাকতেন সাবধানে রাখতেন। বেরিয়ে গেলে পাগলী ছুটোছুটি করে বেড়াত। আজ আমাদের সবাইকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বল্লেন—আর গোপন করা উচিত নয়। সারদাবাবু অমন মহাশয় লোক, উনিই ত সেদিন গিছলেন আর কি? যাহোক আমরা এখন নিশ্চিন্ত হলুম। আপনি Shockটা কাটিয়ে উঠেছেন ত?' আমি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া—"

সারদাকৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি জুড়ি আসিয়া বারান্দার সম্মুখে লাগিল। একজন খানসামা কোচবাক্স হইতে নামিয়া গাড়ীর লণ্ঠনের আলোকে বরদাকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া সেলাম করিয়া বলিল, 'জমীদার বাবুর বড় অসুখ। আপনাকে এখনই যেতে হবে।'

'চল' বলিয়া বরদাকৃষ্ণ উঠিলেন বলিলেন, 'সারি, বাকিটা বুঝে নিয়েছি।'

স্নেহপাশ

ভগবতীর ছেলেটি যখন দুই বৎসরের, তখন তাহার স্বামী মারা গেল। কলিকাতা সহরে সামান্য একখানি বাড়ীর একটি কক্ষ ও একটি দালান ভগবতীর স্বামী ভাড়া লইয়াছিল। অন্যান্য কক্ষে অপরাপর লোক বাস করিত। দালানটিতে রন্ধন হইত। কক্ষে বাস ও শয়ন।

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে ভগবতী চারিদিক অন্ধকার দেখিল। এই অতি ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিবার মত অর্থও তাহার নাই। তাহার স্বামীর দেশস্থ বাড়ী ও জমী যাহা ছিল, তাহা অনেক দিন পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। ভগবতীর পিতৃকুলেও কেহ ছিল না। এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা ছিল। সেও এই বিপদের সংবাদ পাইয়া, পাছে ছেলে লইয়া ভগবতী গলগ্রহ হয় এই ভয়ে, দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। প্রতিবেশিনী রমণীগণ আসিয়া সহানুভূতি জানাইল বটে; কিন্তু তাহারা সকলেই গরীব,—সাহায্যের ক্ষমতা কাহারও কিছু নাই।

যে বাড়ীতে ভগবতী বাস করিত, তাহার কিছু দূরেই নিশানাথ বাবুর বিশাল নিকেতন। রাস্তার উপর লৌহনির্ম্মিত ফটক। রেলিংএর মধ্য দিয়া বাগান দেখা যাইতেছে। সবুজ ঘাসের উপর ফড়িং লাফাইতেছে। ক্রোটনগাছগুলি কাঁকর দেওয়া রাঙা রাস্তার দুইপাশে শোভা পাইতেছে। মাঝখানে একটি ফোয়ারা সময়ে অসময়ে জল উদ্গীরণ করিতেছে।

তাহার চারিপার্শ্বে প্রস্তরগঠিত চৌবাচ্ছা। তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে। ভগবতীর পুত্র নলিনাক্ষ পিতার কোলে চড়িয়া রোজ বিকালে এই বাগানে আসিত ও লাল মাছ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া দুই হাত বাড়াইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইত। নিশানাথবাবু ছেলেটিকে নিজে কোলে করিয়া বাগানের চারিদিকে বেড়াইতেন, বড় বড় গোলাপ তুলিয়া হাতে দিতেন। শিশু আনন্দে অস্ফুট কলধ্বনি দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত। নিশানাথবাবুর হৃদয় গলিয়া যাইত। তিনি অপুত্রক ছিলেন।

নিশানাথবাবু শুনিলেন, নলিনাক্ষের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে দিন বিকালে আর তিনি নলিনাক্ষকে দেখিতে পাইলেন না। কলহাস্যে অর্দ্ধনগ্ন বালক তাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল না। তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিল না। নাসিকা-লেহনের প্রয়াস করিল না। নিশানাথ বাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

নলিনাক্ষের ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয়ও বুঝি সেই বৈকালিক ভ্রমণের অভাব অনুভব করিয়াছিল। ভগবতী যখন আকুল শোকাবেগে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া রুদ্ধযাতনার নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তখন চঞ্চল শিশুটিও মায়ের গায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভগবতীর অশ্রুস্রোত আরও উচ্ছ্বসিত হইল। শিশুকে দেখিয়া মৃত স্বামীর স্মৃতি অনল-বর্ণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যন্ত্রণায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন মাতাপুত্র একত্রে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল।

নিশানাথবাবু সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভোজনে বসিলে তাঁহার

পত্নী উমা তাঁহাকে বলিল, "শুনেছ, নলিনাক্ষের বাপ মারা গেছে। আহা, তাদের আপনার বল্‌তে কেউ নেই। তুমি একবার খবর নাও।"

নিশানাথ বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, অনেক দিন হ'তে একটা কথা তোমাকে বল্‌ব মনে করছি। আজ বল্‌বার সময় এসেছে। নলিনাক্ষের মা আজ আশ্রয়হীনা। ছেলেটির উপরও আমার বড় মমতা হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লই। আমাদেরও আর ছেলেপুলে কিছুই নাই। নলিনাক্ষের মাতাকে মাসিক অর্থ সাহায্য দিলে তাঁরও কোন কষ্ট থাক্‌বে না।"

উমার মনে নলিনাক্ষের ছবি জাগিয়া উঠিল। কি সুন্দর ছেলেটি! উজ্জ্বল বিশাল নয়ন, দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, সুগোল অবয়ব —দেখিতে যেন রাজপুত্র। উমার হৃদয়ে যে স্নেহবন্যা এতদিন স্থানাভাবে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই, আজ এই বালকটিকে পাইয়া তাহা বাঁধ ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিল। উমা সানন্দে বলিল, "আহা, তাই কর। দিব্য ছেলেটি। তার মায়ের দুঃখ আর দেখা যায় না।"

কিছুদিন কাটিয়া গেল। শতশোকজর্জ্জরিতা হইলেও ভগবতীর দিন কাটিয়া গেল। অতি সামান্য যে অর্থ তাহার নিকট ছিল ও নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইল, তাহাতে কিছুদিন অতি ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিল।

বিপদসাগরে একটি বৃহৎ তরঙ্গ তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার যন্ত্রণার

অবসান হয় নাই। আবার এক বিরাট ঊর্ম্মি গর্জ্জন করিয়া তাহাকে ডুবাইতে আসিল।

যে বাড়ীতে ভগবতী থাকিত তাহার অন্য একটি কক্ষ ভাড়া লইয়া নগেন্দ্র নামে এক যুবক বাস করিত। তাহার বাড়ী বিদেশে। কলিকাতার কোন রঙ্গালয়ে সে প্রবেশ করিয়াছিল। অভিনয়-বিদ্যা দেখাইবার বড় একটা সুবিধা সে করিতে পারে নাই। কারণ সে নিজে সকল নাটকের নায়কের অংশ অভিনয় করিতে চাহিলেও রঙ্গাধ্যক্ষ তাহাকে সৈন্য, দস্যু, অথবা দূত ও ভৃত্যের অংশ দিতেন। কাজেই এই অহঙ্কৃত অভিনেতা তাহার প্রতিভা কেহ বুঝিতে পারিল না বলিয়া, যাহার তাহার কাছে আক্ষেপ করিত এবং সময় ও শ্রোতা পাইলেই বিরাট গর্জ্জনে অভিনয়ের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে থাকিত। তাহার দৃষ্টি ভগবতীর উপর পতিত হইল। ভগবতীর সে স্থলে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বাড়ী ছাড়িতেও পারিল না। কারণ বাড়ীর যে ঘর ভাড়া লইয়াছিল, অনেক দিন হইতে তাহার ভাড়া দিতে পারে নাই। ভাড়া না দিয়া উঠিয়া যাইতে পারিবে না।

এই সময় নলিনাক্ষই তাহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল। কখনও কল্পনার চক্ষে দেখিত, নলিনাক্ষ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কৃতী হইয়াছে। সম্পদে তাহার গৃহ পূর্ণ। নলিনাক্ষের বধূর মূর্ত্তিটিও নয়নপথে যেন ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু কল্পনার এ মনোরম দৃশ্যও দীর্ঘস্থায়ী হইত না। সংসারের নিদারুণ জ্বালা এ সুখের স্বপ্নেও বাধা প্রদান করিত ও সংসারের দারুণ অভাব সজীব মূর্ত্তিতে ভগবতীকে অস্থির করিয়া তুলিত।

এইরূপ সময়ে নিশানাথবাবুর একজন দাসী ও একজন সরকার আসিয়া ভগবতীকে জানাইল,—নিশানাথ নলিনাক্ষকে পোষ্যপুত্র লইতে চাহেন। ভগবতীকে নিশানাথবাবু মাসিক যে বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাতে ভগবতীর আর কোন ক্লেশ থাকিবে না। সরকার বিবিধ প্রকার বচন-বিন্যাসে নলিনাক্ষের ভাবী সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিল। ভগবতীও পুত্রকে দেখিতে পাইবে, যখন ইচ্ছা নিশানাথবাবুর গৃহে যাইতে পারিবে। তাহার নিজের ক্লেশ থাকিবে না, নলিনাক্ষেরও উন্নতি হইবে। সুতরাং ভগবতীর আপত্তির কোনও কারণই থাকিতে পারে না। দাসীও বিবিধ কথায় বুঝাইল। নিশানাথ বাবুর পত্নী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এটি তাঁহার একান্ত অনুরোধ। ছেলেটির কোন অযত্ন হইবে না। ভগবতী ইচ্ছা করিলে নিশানাথবাবুর বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন।

ভগবতী প্রথমটা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কে সন্তানকে তাহার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে? সে কেন তাহার সন্তানকে ছাড়িয়া দিবে? তাহার একমাত্র অবলম্বন, যাহাকে ধরিয়া আজও সে জীবিতা, কি করিয়া তাহাকে ছাড়িবে? নলিনাক্ষই যদি গেল, তবে তাহার জীবনধারণের ফল কি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত চিন্তার উদয়। নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সুখের জন্য, নলিনাক্ষের সর্ব্বনাশ করিবে? তাহার যেরূপ অবস্থা তাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহ হওয়াই দায়, নলিনাক্ষকে লেখাপড়া শিখাইবে কোথা হইতে? আর নিশানাথ বাবুর গৃহে নলিনাক্ষ যে আদর-যত্নে সম্বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। তবে কেন নিজের সুখের জন্য পুত্রের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যচিত্র মুছিয়া ফেলিবে? আর এমনও ত' নয় যে, নলিনাক্ষের সহিত আর দেখা হইবে না। নলিনাক্ষের ভাল হউক, নলিনাক্ষ সুখে থাকুক,—ভগবতীর আর কিছুই প্রার্থনা নাই।

এইরূপে সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মাতা নিজ জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিল। তখন বুঝে নাই যে কি করিতে বসিয়াছে। তখন বুঝে নাই, ভবিষ্যতের অদৃশ্য রাজ্যে তাহার জন্য কত দুঃখ সঞ্চিত আছে।

নিশানাথবাবুর গৃহে মহোৎসব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মন্ত্রোচ্চারণ শব্দে, নিমন্ত্রিত বর্গের কোলাহলে, ভিক্ষুকগণের কলরবে পল্লীবাসী সকলেই জানিল, নলিনাক্ষকে নিশানাথ বাবু পোষ্যপুত্র লইতেছেন। সকলেই বুঝিল ভগবতীর কপাল ফিরিয়াছে।

তখন প্রতিবেশিবর্গের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভগবতী যখন দরিদ্র নিঃসহায় ছিল, তখন অনেকেই তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত। আজ তাহারাই তাহার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে ঈর্ষান্বিত হইল।

প্রতিবেশীনীগণও হিংসার তাড়নে বলিতে লাগিল, "মরণ অমন টাকার! ছেলে বিলিয়ে টাকা পাওয়ার চেয়ে শুকিয়ে মরা ভাল।"

কিন্তু ভগবতীর হৃদয়ের বেদনা কেহ বুঝিল না। উৎসবের সময় নিশানাথ বাবুর গৃহে সে ছিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যাকালে

নিজ কক্ষটিতে ফিরিয়া আসিয়া শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল। বাধা না মানিয়া অশ্রুপ্রবাহ তাহার উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। স্বামি-বিয়োগে তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার নলিনাক্ষ ছিল। আজ সেই হাস্যমুখ বালকটিও পরগৃহে। শূন্য শয্যায় নলিনাক্ষের মলিন কাঁথাটি ও ছোট বালিশটি বুকে ধরিয়া ভগবতী অধীর হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

সেদিন নগেন্দ্র সুরামত্ত অবস্থায় বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। সে পোষ্যপুত্রগ্রহণের সংবাদ সমস্তই অবগত ছিল। তাহার রাক্ষসোচিত প্রকৃতি এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। "ছেলেটা গিয়াছে, ভালই হইয়াছে।" এই ভাবতে ভাবিতে সে ভগবতীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা হইলেও ভগবতী আলো জ্বালে নাই। শোকাবেগে দ্বাররুদ্ধ না করিয়াই শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল। নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া রোদনের শব্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইল ও নাটকীয় নায়কের দুই চারি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা পাইল। তাহার স্বর শুনিয়াই ভগবতী তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ও নিজ অবস্থা বুঝিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা এই চীৎকারে সেখানে অসিয়া পড়িল। ভগবতীর কথা শুনিয়া একজন পুরুষ মদিরামত্ত নগেন্দ্রের গলদেশ ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে গেলেন। দুরাত্মা নগেন্দ্র তখন তীব্র হলাহল উদ্গীর্ণ করিল। সকলকে বুঝাইল, ভগবতীই তাহাকে উৎসাহ দিয়াছে। সেইজন্য ছেলেটিকে পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহা না হইলে সে এ কার্য্যে

অগ্রসর হইবে কেন? রঙ্গালয়ের কত অভিনেত্রী তাহার কৃপা-কটাক্ষ পাইবার জন্য লালায়িত।

কলঙ্কসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহার প্রভাব অসীম। কেহ কেহ ইহা অবিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু তাহায় দুই চারিটি কথায় ভগবতীর চরিত্রে দুরপনের কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হইয়া রহিল।

পরদিন পল্লীময় এই কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। যাঁহারা ভগবতীর পুত্রের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন শতমুখে নানা অলীক জনরবের স্থষ্টি করিয়া অন্তরের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন। এমন কি নলিনাক্ষের কথা লইয়া দেবোপম-চরিত্র নিশানাথবাবুর নামেও কলঙ্ক আরোপ করিতে লোক সঙ্কুচিত হইল না।

এ সংবাদ গুপ্ত থাকে না। নিশানাথ বাবুও এ সংবাদ-শ্রবণে ব্যথিত হইলেন। তিনি ভগবতীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় ভগবতী যেন নিশানাথবাবুর বাড়ীতে না যান। এ পল্লী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার অপর অংশে বাস করিবার জন্য নিশানাথবাবু এক বাড়ী ঠিক করিয়াছেন। সেই বাটীতে ভগবতী গিয়া বাস করুন। প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে খরচ প্রেরিত হইবে।"

ভগবতী কোন উত্তর দিল না। পরদিন হইতে তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

সময়-চক্রের আবর্ত্তনে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া গেল। নলিনাক্ষ এখন বিংশতিবর্ষীয় যুবক। নিশানাথ বাবুর মৃত্যু

হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে বহু সঙ্গী আসিয়া নলিনাক্ষকে ঘিরিয়াছে। প্রত্যহ অপরাহ্নে যুগলাশ্ববাহিত সুসজ্জিত যান নলিনাক্ষ ও তাহার বন্ধুবর্গকে লইয়া কলিকাতার রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিয়া যাইত। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত। চারিদিকে রব উঠিয়াছিল, নিশানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য নলিনাক্ষ দুই হাতে উড়াইতেছে।

একদিন অপরাহ্নে বহুমূল্য বসনে সজ্জিত নলিনাক্ষ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া শকটারোহণ করিতেছে, এমন সময়ে এক মলিনবসনা বৃদ্ধা আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিল। নলিনাক্ষ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল এবং বলিল, "তুমি কে? কি চাও?"

বৃদ্ধা বলিল, "তোমার মাকে মনে পড়ে?"

নলিনাক্ষ। মা? মা ত বাড়ীতে আছেন। কেন?

বৃদ্ধা। সে মা নয়, যার গর্ভে তোমার জন্ম, তাঁকে মনে পড়ে?

নলিনাক্ষের মনে পূর্ব্বকথার স্মৃতি জাগিল। নিশানাথ তাহাকে সকলই বলিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের ধারণা ছিল, তাহার জননী কুলত্যাগিনী হইয়া গিয়াছেন। আজ সহসা সে হৃদয়ে আঘাত পাইল। তাহার মাতার মূর্ত্তি তাহার মনে পড়ে না। সে অতি শৈশবে নিশানাথবাবুর গৃহে আনীত হইয়াছিল। নলিনাক্ষ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা বলিল, "যদি তোমার মাকে দেখ্‌তে চাও ত' আমার সঙ্গে এস।" নলিনাক্ষের বন্ধুদের মধ্যে একজন বলিল, "নলিন্, এটাকে তাড়িয়ে দাও। নাও গাড়ীতে উঠে পড়, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

নলিনাক্ষ বলিল, "তোমরা আজ যাও। কাল এস।" পরে বৃদ্ধাকে বলিল, "তুমি এই গাড়ীতে ওঠ। কোথা যেতে হবে বল।" বৃদ্ধার নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা অভিমুখে সুসজ্জিত নলিনাক্ষ জীর্ণবসনা বৃদ্ধাকে লইয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিল। রাস্তার লোক অবাক্ হইয়া এই আরোহীদ্ব'টিকে দেখিতে লাগিল।

নলিনাক্ষের সেই বন্ধুটি বলিল, "কি বিপদ! কোথাকার এক আপদ এসে আমোদটা মাটি করে দিলে। চল যাওয়া যাক্।" তখন সকলেই নলিনাক্ষের বুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে সরিয়া পড়িল।

নলিনাক্ষের শকট এমন এক স্থলে আসিয়া পৌছিল, যেখানে গলি অতি সঙ্কীর্ণ। শকট ছাড়িয়া পদব্রজে নলিনাক্ষ বৃদ্ধার অনুসরণ করিল। দুই তিনটি অতি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলি অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধা এক খোলার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল ও অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া খুলিল। সম্মুখের ঘর পার হইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া নলিনাক্ষকে ডাকিল। নলিনাক্ষ সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহখানি ক্ষুদ্র। এক কোণে একটি শয্যা। তাহার উপর এক রমণীর দেহ। একটি মাটীর কলসী, ভাঁড় ও দুই একটি তৈজস বিশৃঙ্খলভাবে নিপতিত। নলিনাক্ষকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধা কহিল, "ঐ তোমার মা।"

নলিনাক্ষ অগ্রসর হইয়া রমণীর উপর মুখ অবনত করিল। রমণীর চক্ষু নিমীলিত, মুখ প্রশান্ত, সর্ব্বাঙ্গ কঠিন। নলিনাক্ষ বুঝিল, তাহার মাতার প্রাণহীন দেহ তাহার সম্মুখে।

কিন্তু নলিনাক্ষের মনে মাতৃবিয়োগ-যন্ত্রণার কোন তীব্রতা

অনুভূত হইল না। মনে হইল বটে, এই রমণী তাহার গর্ভ-ধারিণী; হয়ত নিদারুণ ক্লেশে অনেক দুঃখ সহিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সে মনে মনে দুঃখিত হইল, কিন্তু যথার্থ মাতৃহীনের বেদনা অনুভব করিল না। বৃদ্ধা তীব্র নয়নে তাহার ভাব দেখিয়াছিল। সে বুঝিল, সে শোকে বিশেষ অভিভূত নয়। তখন সে আর থাকিতে পারিল না। বলিল, "দেখ্‌ছ ত—হতভাগিনীর মৃতদেহ দেখ্‌ছ ত? পৃথিবীতে আসিয়া অবধি বেশী দিন সুখভোগ করিতে পায় নাই। বলিত, স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই সুখে কেটেছে। স্বামী মারা গেলেন। দুই বছরের একটি ছেলে, তাকে কি করে মানুষ করবে এই ভাবনায় আকুল হয়ে পড়্‌ল। ছেলেটিকে একজন বড়লোক পুষ্যিপুত্তুর নিলে। ছেলের ভালর জন্য হতভাগিনী নিজের বুক চিরে দিলে। তার পর—এমন দেবীর নামেও কলঙ্ক রটনা হ'ল। হতভাগিনী পালিয়ে এল। ভোর রাত্তির, আমি গঙ্গাস্নান করে আসছি—অভাগিনী গঙ্গায় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। কত বোঝালেম,—দুর্জ্জনের কথায় তার কি ক্ষতি, বল্লেম। ছেলের মুখ চেয়ে বাঁচতে বল্লেম। অভাগিনী শুন্‌লে। আমার ঘরে এসে রইল। দিনের বেলা গোবর ঘুঁটে দিত। তাই বেচে খাওয়া চল্‌ত। আর দিন রাত্তির ছেলের কথা। নিজে যেতে পারৃত না—আমাকে রোজ পাঠাত, ছেলে কেমন আছে দেখে আয়। ছেলে বড় হ'ল, গাড়ী করে ইস্কুলে যেতে লাগ্‌ল। অভাগিনী বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃত। ছেলে গাড়ী চড়ে যেত—অনিমিষে চেয়ে থাকৃত—আর ঝর্ ঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়্‌ত। ইস্কুলের ছুটীর

সময় রোজ ইস্কুলের সামনে দাঁড়াত, ছেলে গাড়ীতে উঠ্‌ত, আর তার চোখ বেয়ে জল পড়্‌ত। ইস্কুলের ছেলেরা পাগ্‌লী বলে ক্ষেপাত, ছেলেও তাতে যোগ দিত। অভাগিনী সব সইত। ভাল খাবার জিনিষ কোথাও পেলে নিজে খেতে পারত না—গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌ত। ছেলের একবার অসুখ হয়—সামান্য জ্বর। অভাগিনী তিনদিন কিছু খায় নাই। দিনে তিনবার আমায় খবর নিতে পাঠাত। আমি তাকে বাঁচাবার জন্যে বল্‌তেম ভাল আছে। ছেলে বড় হ'ল। নিজে কর্ত্তা হয়ে রোজ বিকালে গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। অভাগিনী রোজ রাস্তায় সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের শরীরে যত্ন নাই—অসুখ হ'ল। জ্বরে কাঁপছে, তবু রোজ বিকালে তাকে ধরে রাস্তায় নিয়ে যেতে হ'ত—ছেলে যাবে দেখ্‌বে। পরশুদিন কি দুর্যোগ মনে আছে ত? মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে জ্বরগায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। কারো মানা মান্‌লে না। ছেলের গাড়ী সে দুর্য্যোগে এল না। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। লোকজনে ধরাধরি করে এইখানে রেখে গেল। সেই রাত্রিতেই বিকার। সমস্ত রাত বক্‌তে লাগ্‌ল। 'নলিনাক্ষ নলিনাক্ষ' বলে চেঁচাতে লাগল। ছেলেটি যখন ছোট ছিল, তখন সে যে কাঁথা ও বালিসে শু'ত, সেই দুটি বুকে চাপিয়া ধরে আর 'নলিনাক্ষ' বলে ডাকে। কাল রাত চারটের সময় অভাগিনীর সকল যন্ত্রণা ফুরিয়েছে।"

নলিনাক্ষ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িয়া মৃতা জননীর দেহ সিক্ত করিতেছিল। ক্ষুদ্র গৃহে একমাত্র বাতায়ন-পথে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ

প্রবেশ করিয়া মৃতা ভগবতীর মুখে পতিত হইল। কি প্রশান্ত স্নেহময় সেই মুখ!

তাহার পরদিন উমা নলিনাক্ষকে ডাকাইয়া বলিল, "বাবা, পুরুতমশায় বল্‌ছেন, তুমি এখন আমাদের গোত্র হয়েছ। তোমার অশৌচ হতে পারে না।" নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, উত্তরীয়-ধারী নলিনাক্ষ বলিল, "আমার মা মরেছে। আমি ভগবতীর ছেলে।"

রেলযাত্রী

একটি ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন এক্সপ্রেস ট্রেণ প্ল্যাটফর্মে আসিয়া গিয়াছে। আমার একে থার্ড ক্লাসের টিকিট, তাহার উপর যখন দেখিলাম যে আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছে, তখনই বুঝিলাম যে কপালে বহু কষ্ট আছে। যে গাড়ীতে উঁকি দিয়া দেখি, সেই গাড়ীই ভর্ত্তি। বাঙ্গালী আরোহী থার্ডক্লাসে ত দেখিতে পাইলাম না; ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের জানালা হইতে চসমামণ্ডিত চক্ষু এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক উঁকি দিতেছেন দেখিলাম। থার্ডক্লাসের সকল গাড়ীগুলিই হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ। এক একটি কামরায় ঢুকিতে যাই, অমনি তাহাদের দারুণ কলরব। মহা মুস্কিল হইয়া পড়িল, গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে এগাড়ী হইতে ওগাড়ী ছুটাছুটি করিতেছি এমন সময় থার্ডক্লাসের একটি গাড়ীর জানালা হইতে একজন মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয় কোথায় যাবেন ?" রেলগাড়ীতে সকলেই স্বার্থপর। পাছে অপর কেহ উঠে এই ভয়ে বড় একটা কেহ যাচিয়া আলাপ করেন না। তাই ইঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তৎক্ষণাৎ মুটিয়াটিকে পিছনে লইয়া সেই গাড়ীর দ্বারে গিয়া বলিলাম "আসানসোল। একটু জায়গা হবে কি ?" "আসুন না" বলিয়া ভদ্রলোকটি দরজা খুলিয়া দিলেন। কুলির মাথা হইতে তোরঙ্গ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। বক্‌সিসের জন্ত কিছুক্ষণ

গোলমাল করিয়া সে চলিয়া গেলে তোরঙ্গটিকে একটি বেঞ্চের নীচে ঠেলিয়া দিয়া ও বিছানাটি উপরকার ঝোলান তক্তাখানির উপর রাখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বসিলাম।

দেখিলাম গাড়ীর মধ্যে আর দুই জন বাঙ্গালী রহিয়াছেন। তাঁহারা প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চে বসেন নাই বলিয়া ছুটাছুটি করিবার সময় দেখিতে পাই নাই। একজন শীর্ণকায়, তাঁহার গায়ে একটি কাল কোট, গলায় কম্ফর্টার জড়ান, কোটের উপর একখানি সবুজ আলোয়ান, থান ধুতি পরিধান, পায়ে ক্যানভাসের জুতা। তিনি একটি ব্যাগের উপর হেলান দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। আর একজন বেশ বাবুগোছের,—তাঁহার গায়ে আলষ্টার, মাথায় নাইট ক্যাপ্। সিগারেট ধরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি ধূমপান করিতেছিলেন। যে ভদ্রলোকটি আমাকে সেই গাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন তিনি স্থূলকায়, তাঁহার গোঁফ, দাড়ি কামানো, গায়ে একখানি বালাপোষ, পায়ে চটিজুতা। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া মনে হইল।

আমি বসিয়া বলিলাম, "ওঃ, আজ দেরীতে এসে যে বিপদে পড়েছিলুম। কোনও গাড়ীতে জায়গা পাই না। আর ভীড়ও কি অসম্ভব হইয়াছে!"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এই শীত, তবু গাড়ীর ভিতরে বসে কি রকম গরম বোধ হচ্ছে, যেন হাঁফ ধরবার যোগাড়।" তিনি একে স্থূলকায়—তার উপর আমাকে বসিবার স্থান দিয়া আমার ও একজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানীর চাপে পিষ্ট হইতেছিলেন। কাজেই হাঁফ লাগিবারই কথা।

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি ব্যাগ হইতে ভর তুলিয়া লইয়া উঠিয়া

বসিয়া বলিলেন "গরম! তা হবেই ত। আমি এ গাড়ীতে রয়েছি গরম হবে না? শীতের দিনে ভালই ত।"

আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। প্রথমে মনে করিলাম তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবে কৌতুকের কোনও লক্ষণ বোঝা গেল না। আলষ্টারপরা বাবুটি মুখ হইতে এক রাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "কি রকম?"

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এই দেখুন না কেন সূর্য্য আমার কাছে কাছেই থাকেন। যেখানে থাকি সেখানে কাজেই রোদ হয়, গরম বেশ পড়ে।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম। শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনারা কি ঠাট্টা মনে করলেন না কি? আমি ঠাট্টা কচ্ছিনে। বিলাতে এত ঠাণ্ডা কেন জানেন?—সেখানে আমি যাইনা। আমি থাক্‌লে সূর্য্য আমার কাছেই উঠ্‌ত। সে দেশটাও গরম হ'ত।"

বাবুটি সহাস্যে বলিলেন, "তবে সাহারা মরুভূমি এত গরম কেন? মহাশয় ত আর সেখানে থাকেন না।" উত্তর হইল, "সাহারায় বালি আছে, শীঘ্রই গরম হয়। সেই তার কারণ।" আমরা সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম।

তিনি অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাসছেন যে? আমি কি তামাসা কচ্ছি? আমি কে জানেন? বিলাসপুর স্কুলের হেডমাষ্টার কিরণচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন? আমিই সেই কিরণচন্দ্র বসু।" কথাগুলি এরূপ

ভাবে উচ্চারিত হইল, যেন তিনি কোন ছদ্মবেশী সম্রাট— আত্মপ্রকাশ করিলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

আমি অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, "সূর্য্য আপনার কাছে থাকেন কি রকম?" তিনি তখন ব্যাগ খুলিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি হাতে করিয়া বলিলেন "আপনারা ত সকলে জানেন পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু ইহা ভ্রম—বিষম ভ্রম। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যই ঘুরিতেছে। আমিও আগে আপনাদের মত ভুল শিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে ভুল আর নাই। আমি প্রমাণ করিতে পারি যে সূর্য্য ঘুরিতেছে। এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখুন।" এই বলিয়া সেই কাগজতাড়াটি আমার হাতে দিলেন। খুলিয়া দেখি এক সুবৃহৎ প্রবন্ধ। ভাষার খুব বাঁধুনি। "আজ পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী বহু মনীষিগণের বিশ্বাস যে নিউটন, গ্যালিলিও প্রভৃতির প্রচারিত মত অভ্রান্ত। কিন্তু ধীরভাবে প্রমাণের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অমূলক।..." ইত্যাদি। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি আমার কাণে কাণে বলিলেন, "ও পাগল।" আমিও তখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি তখন বলিলাম, "মহাশয় এ গূঢ় সত্য কতদিন জানিতে পারিয়াছেন?"

"শুনবেন? সে অনেক কথা। আপনাদের সব খুলিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন।

আমার প্রথম চাকরি এতনাদপুর গ্রামে। তখন সবে বি, এ পাশ করিয়াছি। বেঙ্গলীতে এক চাকরির বিজ্ঞাপন

দেখিয়া দরখাস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ষ্টেশনের নিকট ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে একটি ছোটখাট স্কুল। সেই স্কুলে ইংরেজী পড়াইতে হইবে।

প্রথম যেদিন আমার কর্ম্মস্থলে পৌছিলাম, সেদিন রবিবার। স্কুল বন্ধ। স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। তাঁহার নাম—লালা রামকিশোর। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া ছোট স্কুল বাড়ীটিতে লইয়া গেলেন। সেইখানেই আমার বাসের জন্য একটি ছোট ঘর পাইলাম। বেতন অধিক নয়, নিজেই রাঁধিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। বাসন মাজিবার জন্য গ্রামস্থ একটি রমণী নিযুক্ত হইল। তাহার নাম জানকী।

প্রথম যেদিন সে কাজ করিতে আসিল, তাহার সঙ্গে নয় দশ বছরের একটি ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি অতি সুন্দর। বড় বড় চোখ, কালো গোছা গোছা চুল অযত্নে মুখের আশে পাশে পড়িয়াছে। আমি জানকীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কে?"

জানকী এক করুণ কাহিনী শুনাইল। বালকের পিতামাতা উভয়েই মৃত। বালক যখন দুই বৎসরের তখন তাহার ভার লইবার আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা জানকীরও আর কেহ আত্মীয় নাই। তাই সে পরম যত্নে বালকটিকে লালন পালন করিয়াছে। জানকী শেষ বয়সে এই বালকটিকে পাইয়া তাহার চিরসঞ্চিত মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাইয়া তাহাকে সে স্নেহযত্ন করিয়া আসিতেছে।

এরূপ অপরিসীম আদর পাইলে স্বভাবতঃ বালক দুরন্ত হয়, কিন্তু এ ছেলেটি সেরূপ ছিল না। প্রথম পরিচয়েই

বুঝিলাম বালকটি অতি ধীর ও শান্ত। এই শ্রেণীর অন্যান্য বালক হইতে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রামের বালকেরা স্কুলের ছুটির পর বাড়ী যাইবার সময় পথে কত ঝগড়া, মারামারি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিত; এই বালকটি বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া তাহা দেখিত ও একপাশ দিয়া ধীরভাবে নীরবে চলিয়া যাইত। জানকীব নিকট কখনও কোন আবদার করিত না। জানকী যখন আমার বাসন মাজিত, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানের একখানি ছোট গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। কথা কহিবারই বা তেমন লোক কোথায়? আমি আবার ছোট ছোট ছেলেদের সহিত কথা কহিতে বড় ভালবাসিতাম। কাজেই জানকীর পালিত পুত্র কিষণলালের সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বালকটি আমাদের স্কুলেই পড়িত। প্রধান শিক্ষক বলিয়া ভয়ে প্রথমে সে ভাল করিয়া আলাপ জমাইবার সুবিধা করিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমশঃ আমা'দর দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

অপরাহ্নে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি খাটিয়াখানির উপর যখন গা ঢালিয়া দিয়া একটু বিশ্রাম করিতাম, তখন কিষণলাল খানদুই জীর্ণ বই ও শ্লেট লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত। কিছুক্ষণ পড়াইতাম। তারপর গল্প হইতে থাকিত। আমাদের দেশের ছেলেরা কেমন, আমাদের দেশের পল্লীজীবনের বিবরণ, তথাকার গুরুমহাশয় ও পাঠশালার ইতিহাস প্রভৃতির চিত্র তাহার মনে ফুটাইবার চেষ্টা করিতাম। সেও নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহা শুনিত।

সব চেয়ে তাহার ভাল লাগিত আমার নিজের বাল্য-জীবনের বর্ণনা। আমি যখন ছোট ছেলে ছিলাম, তখন পাততাড়ি বগলে করিয়া কিরূপে পাঠশালায় যাইতাম, গুরুমহাশয় কিরূপ ছিলেন, কি রকম করিয়া এত লেখাপড়া শিখিলাম প্রভৃতি কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিত। তাহার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত "মাষ্টারজীর" বাল্যাবস্থার বোধ হয় তুলনা করিত। নিজেও বোধ হয় কল্পনা করিত, একদিন "মাষ্টারজী"র মতই পণ্ডিত হইয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইবে।

এইরূপে বেশ সুখে আমাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রামলীলার উৎসব নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল।

একদিন সকালে মুখ হাত ধুইয়া একখানি বই খুলিয়া পড়িতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় দুইজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের কপালে চন্দনরেখা, মাথায় পাগড়ী, বেশভূষায় বোধ হইল যেন পুরোহিত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি ?" তাহারা অনেক কথা বলিতে লাগিল। তাহার সার মর্ম্ম এই—রামলীলার উৎসব আসিতেছে। এই উৎসবে রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির চরিত্র অভিনয়ের জন্য তাহারা লোক সংগ্রহ করিতেছে। রামের চরিত্রে তাহারা বিষণলালকে চায়। কিছুদিনের জন্য তাহাকে ছুটি দিতে হইবে।

আমি শুনিয়াছিলাম পশ্চিমে রামলীলার খুব ধুম। রামায়ণের ঘটনা সকল অঙ্গভঙ্গীসহকারে অভিনীত হইয়া

থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিষণলাল রাজি ত?" তাহারা বলিল "হাঁ, তাহাকে রাজি করিয়াছি।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, তাহার ছুটি মঞ্জুর।" তাহারা অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় জানকী কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল, সে কিষণলালকে কিছুতেই রাম সাজিতে দিবে না। যে ছেলে দেবতা সাজে সে কিছুতেই বাঁচে না। সে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস কিষণলাল রাম সাজিলে তাহার নিশ্চয়ই অমঙ্গল ঘটিবে।

আমি তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে কোনও কথা শুনিল না। বলিতে লাগিল "গরীব ব'লে এত জুলুম! কিষণলালের বাপ মা নেই ব'লে কি তাকে দেখবার কেউ নেই? পুরুতদের নিজের ছেলেদের সাজাক্ না। আমার ছেলেকে আমি কখনও ছাড়ব না।"

তাহার পরদিন সকালে কিষণলালকে লইয়া পুরোহিত দুইজন উপস্থিত। কিষণলালকে নূতন কাপড়, নূতন জামা ও টুপি কিনিয়া দিয়াছে। তাহার আনন্দ দেখে কে? সে বলিতে লাগিল "মাষ্টারজী, আমার একটা ধনুক আছে। সেই ধনুকে তীর দিয়া রাবণ বধ করিব।" কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তি হইলে হইবে কি? জানকী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে রাজি নয়। পুরোহিতেরা আমাকে ধরিয়া বসিল,—"হুজুর যা করেন। জানকীকে বুঝাইয়া বলুন। সে আমাদের কথা মানে না। আপনি বলিলে নিশ্চয়ই শুনিবে।"

তাহাদের কাতর প্রার্থনায় আমি জানকীকে ডাকাইলাম।

সে পুরোহিতদের দেখিয়াই গালি দিতে আরম্ভ করিল। বহু-কষ্টে তাহাকে থামাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা তর্কের পর সে আমায় বলিল "মাষ্টারজী, আপনি আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দিবেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তোর কোনও ভয় নাই। আমি শপথ করিতেছি তোর ছেলের কোনও বিপদ ঘটবে না।"

জানকী বলিল, "ভগবান্ সূর্য্য সাক্ষী রইলেন।" সে চলিয়া গেল।

রামলীলার মহা ধুম আরম্ভ হইল। আমি তাহার পরদিন হইতে ঘোর জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। জ্বর ক্রমশঃই বাড়ীতে লাগিল। সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম। কতদিন কাটিয়া গেল তাহা কিছুই জানি না।

সজ্ঞান হইয়া দেখিলাম,—আমার দাদা বিছানার পাশে বসিয়া রহিয়াছেন। বৌদিদি এক কোণে ঔষধের শিশিগুলি সাজাইয়া রাখিতেছেন। বুঝিলাম তাঁহাদের সংবাদ দিয়া আনান হইয়াছে। আমি বলিলাম "আজ কত তারিখ ?" দাদা বলিলেন "কথা কয়োনা। চুপ্ করে শুয়ে থাক।" বৌদিদি আমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমার বিছানার কাছে আসিলেন। দুই ফোঁটা চোখের জল তাঁহার গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

এই সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। বেগে উন্মাদিনীর মত জানকী সে কক্ষে প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া বলিল "মাষ্টারজী, আমার কিষণকে ফিরে দাও। সূর্য্য সাক্ষী আছেন। আমার কিষণকে ফিরে দাও। তোমার শপথ রাখ।" দুই

তিনজনে ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিষণলাল তাহা হইলে মারা গেছে! কতদিন আমি পড়ে আছি? আমি অসহ্য বেদনায় অধীর হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। মাথার মধ্যে শত সূর্য্য দীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

আকুল ব্যাকুল চিত্তে পুনরায় চোখ খুলিলাম। সমস্ত প্রকৃতি সূর্য্যময় দেখিলাম। কর্ণে শুনিতে পাইলাম, সূর্য্য সাক্ষী! সূর্য্য সাক্ষী! সেই অবধি সূর্য্য আমার সঙ্গ লইয়াছেন—জাগরণে সূর্য্য—স্বপ্নেও সূর্য্য। যেখানে যাই সেখানেই সূর্য্য। ঠিক বলছি আমি,—অবিশ্বাস—

"আসানসোল! আসানসোল!" কুলিরা হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। গাড়ী আসানসোলে আসিয়া পৌছিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কিরণবাবুর গল্পের শেষটুকু আর শুনিতে পাইলাম না।

বামুন ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কল্‌কেতার একখানা টিকিট দাও ত।" ছিটের সার্ট গায়ে, টেরিকাটা কৃষ্ণবর্ণ এক জোয়ান মূর্ত্তি থার্ড ক্লাশ টিকিট-ঘরের কাটা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া একটা টাকা দিয়া বলিল "কলকেতার একখানা টিকিট দাও ত।"

কথা শুনিয়াই টিকিটবাবুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তাঁহার প্রভাব বড় কম নয়। "আপনি" "মশাই" বলিয়াও যখন লোকে তাঁহার সাড়া পায় না, "অনুগ্রহ করে শীঘ্র দিন না" বলিলেও যখন তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট্ টানিতে থাকেন, তখন একেবারে রুক্ষকণ্ঠে 'টিকিট্ দাও ত' শুনিয়া তাঁহার যে রাগ হইবে তাহা বিচিত্র নয়। আর পয়সাও নেহাৎ তিনি কম রোজগার করেন না। পঁচিশ টাকা মাহিনা, তার উপর রোজ একটাকা দুই-টাকা উপরি রোজগার হইয়াই থাকে। আনাড়ি লোক দেখিলেই একটাকা লইয়া চার আনার টিকিট দিয়া ছয় আনা ফেরৎ দিয়া থাকেন। বাকিটা নিজের পকেটেই পড়ে। এই উপরি রোজগারের জোরেই পানীয়বিশেষ পান করিয়া শরীরকে একটু Stimulateও করিয়া থাকেন। কাজেই রক্তবর্ণ চক্ষে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকাটা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "এ টাকা চল্‌বে না।"

ক্রেতাও ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল "চল্‌বে না কি রকম? গড়্‌গড়িয়ে চল্‌বে। চালাকি পেয়েছ? দু কলম লিখে দিলে তোমার চাকুরি পর্য্যন্ত ঘোচাতে পারি তা জান?"

টিকিটবাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। অবশ্য প্রথম এই চাকরিটি যোগাড় করিতে ছয়মাস হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহার এক জোড়া জুতা ছিঁড়িয়াছিল ও কর্ম্মচারীবিশেষকে পরিবারের গহনা বন্ধক দিয়া পঞ্চাশ টাকা ঘুস দিতেও হইয়াছিল। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" তখন উমেদারের অবস্থা। আর এখন তিনি থার্ড ক্লাস যাত্রীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—প্রবল প্রতাপশালী টিকিটবাবু। চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন, যাত্রী কি তাহাও দেখিতে পাইতেছে না?

টিকিটবাবু অন্য এক যাত্রীর পয়সা লইবার যোগাড় করিতেছেন এমন সময় পূর্ব্বোক্ত যাত্রীটি সকলকে ঠেলিয়া টিকিট বিক্রয়ের জানালার সম্মুখ অধিকার করিল ও বলিল "চল্‌বে না! আচ্ছা লিখে দাও তুমি, টাকা চল্‌বে না। তোমায় মজা দেখাচ্ছি। অডিটার বাবুকে বলে তোমার চাকরি ঘুচিয়ে দোব।"

টিকিটবাবুর জ্বলন্ত ক্রোধে যেন বারিবর্ষণ হইল। লোকটা কে? ভাল করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাত্রীটার মুখখানা দেখিয়া, বহু কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন "আরে বামুন ঠাকুর তুমি! তামাসা বোঝ না?" এই বলিয়া সেই টাকাটিই লইয়া তাহাকে টিকিট ও বাকী পয়সা ফেরত দিলেন। অডিটার বাবুর বামুন ঠাকুর সে, রেলওয়ে লাইনে তাহার প্রতাপও কম নহে।

প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। বামুন ঠাকুর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িবার পরই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অডিটার বাবু টিকিটঘরে দর্শন দিলেন। টিকিটবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনার রাঁধুনী ঠাকুর আজ যে কলকেতা গেল।"

অডি। আরে সে বেটা ভয়ানক চোর। আজ তাকে তাড়িয়ে দিলুম।

টিকিটবাবু তখন ভাবিলেন, "ওঃ, বেটা কি পাজী! এখন একবার পাই ত বেটাকে সিধে করে দিই। একথা আগে জান্‌লে কি আর বেটাকে ভয় করতুম?" নিষ্ফল ক্রোধে টিকিটবাবু ফুলিতে লাগিলেন।

* * * *

ইহার মাসখানেক পরে একদিন কলিকাতার এক বৃহৎ ত্রিতল বাটীর দ্বারে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া দক্ষিণদিকে বৈঠকখানা, সেখানে কর্ত্তা বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন, "কে হে? কি চাও?"

কর্ত্তার পৈতৃক কিছু জমিদারী ছিল। সেইজন্য তাঁহার বসিয়া চলে। তিনি জমিদার বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন ও সগর্ব্বে সকলের উপর নিজের প্রভুত্ব দেখাইতেন। কাজেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ঐরূপ মুরুব্বিয়ানা চালে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল "আজ্ঞে, আমার একটু প্রয়োজন আছে।"

বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পদতলে চার আঙ্গুল উঁচু একখানি তক্তাপোষের উপর একটি বিছানা পাতা ছিল। তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "বস।" বলিয়া এক উদ্‌গার

তুলিয়া বলিলেন "ওঃ—পোলাওটাতে বামুন ঠাকুর কাল এমন ঘি দিয়েছিল, এখনও হজম করতে পারি নি। খালি ঢেঁকুর উঠছে।" পাশে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক একখানি টুলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইল।

শীর্ণকায় ব্যক্তি বলিলেন, "আর বলেন কেন? আমরা গরীব লোক—ভাত ডাল খাই। সাত টাকা দিয়ে এক উড়ে বামুন রেখেছি, তা সে ডাল ভাতই রাঁধতে জানে না।

কর্ত্তা। আরে লোকও জোটে না। কাল তপ্‌সে মাছ ভাজা করেছে—সবগুলো চোঁয়া। সে দিন জল খাবারের লুচি ভেজেছিল, তার অর্দ্ধেকটা কাঁচা। হাঁ—তোমার কি দরকার?

ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই শেষের কথাগুলি বলা হইল। ব্রাহ্মণ অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বহু ক্লেশে বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার ছেলে আপনার এখানে কাজ করে। সাম্‌নে যোগটা আছে, তাই মনে করলুম একবার গঙ্গাস্নানটা করে আসি, ছেলেটাকেও দেখে আসি।"

কর্ত্তা। তোমার ছেলে? তার নাম কি?

ব্রা। রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ক। ওঃ—আমাদের বামুন ঠাকুরের বাপ তুমি? তা যাও ঐদিকে। ওরে রামা, বামুন ঠাকুরকে ডেকে দে।

রামা চাকর ব্রাহ্মণকে সে কক্ষ হইতে চাকরদের ঘরে লইয়া গেল। এদিকে কর্ত্তা শীর্ণকায় লোকটিকে বলিলেন "আচ্ছা গাঙ্গুলী মশায়, বাচ্ছা হাঁসের ডিমের কি 'কুসুম' থাকে না?"

গা। কেন থাকবে না?

ক। তবে সে দিন বামুনঠাকুর হাঁসের ডিমের ডান্‌লা

বাড়ীতে বসে থাকবি চল। অখাদ্যগুলো খেয়েছিস, একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেব। যাবি ?"

রজনী রাজী হইল না। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে, মাটির ঘরে খড়ের ছাউনি মনে পড়িতেই তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল। সে এখন বাবু হইয়াছে। পম্পস্থ পায়ে দেয়। শিল্কের চাদরও একখানি সংগ্রহ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ অনেক অনুরোধ করিলেন। রজনী কিছুতেই শুনিল না। শেষে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখানেই তবে থাক্। খাওয়া দাওয়া ত শুনছি ভালই হয়।"

র। কি রকম ?

ব্রা। কর্ত্তা বলছিলেন পোলাও, লুচি, তপসে মাছ এই সব নাকি রান্না হয়।

র। কে বল্লে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাবুর সে দিকে অষ্টরম্ভা! পান্তাভাত নুন মেখে খেয়ে ঢেঁকুর তুলে বলেন, পোলওটার ঘি বেশী হয়েছিল, হজম হয়নি, ঢেঁকুর উঠছে। জল খাবারের সময় লুচি খান, তা আমার উপর হুকুম আছে টাকার মত ছোট ছোট চারিখানি লুচি তৈরি করে দিতে হবে। সখের মধ্যে হাঁসের ডিম খাওয়া, তাও যখন তিন পয়সায় দুটো পাওয়া যায়।

ব্রা। খাওয়া দাওয়া তা হলে সুবিধে নয় ?

র। সুবিধে ? অনবরত টিক্‌টিক্ করছে—এত খরচ হয়ে গেল, তত খরচ হয়ে গেল। একটা শিশিতে করে রাঁধবার তেল দেয়। তাতে ওষুধের শিশির মত দাগ মেরে দিয়েছে। রোজ এক দাগের ভেতর রান্না সারতে হবে। দুধ সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জ্বাল দিয়ে রাখান। সর পড়লে ঢাকা থাকে, পাছে আমি

তুলিয়া বলিলেন "ওঃ—পোলাওটাতে বামুন ঠাকুর কাল এমন ঘি দিয়েছিল, এখনও হজম করতে পারি নি। খালি ঢেঁকুর উঠছে।" পাশে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক একখানি টুলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইল।

শীর্ণকায় ব্যক্তি বলিলেন, "আর বলেন কেন? আমরা গরীব লোক—ভাত ডাল খাই। সাত টাকা দিয়ে এক উড়ে বামুন রেখেছি, তা সে ডাল ভাতই রাঁধতে জানে না।

কর্ত্তা। আরে লোকও জোটে না। কাল তপ্‌সে মাছ ভাজা করেছে—সবগুলো চোঁয়া। সে দিন জল খাবারের লুচি ভেজেছিল, তার অর্দ্ধেকটা কাঁচা। হাঁ—তোমার কি দরকার?

ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই শেষের কথাগুলি বলা হইল। ব্রাহ্মণ অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বহু ক্লেশে বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার ছেলে আপনার এখানে কাজ করে। সাম্‌নে যোগটা আছে, তাই মনে করলুম একবার গঙ্গাস্নানটা করে আসি, ছেলেটাকেও দেখে আসি।"

কর্ত্তা। তোমার ছেলে? তার নাম কি?

ব্রা। রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ক। ওঃ—আমাদের বামুন ঠাকুরের বাপ তুমি? তা যাও ঐদিকে। ওরে রামা, বামুন ঠাকুরকে ডেকে দে।

রামা চাকর ব্রাহ্মণকে সে কক্ষ হইতে চাকরদের ঘরে লইয়া গেল। এদিকে কর্ত্তা শীর্ণকায় লোকটিকে বলিলেন "আচ্ছা গাঙ্গুলী মশায়, বাচ্ছা হাঁসের ডিমের কি 'কুসুম' থাকে না?"

গা। কেন থাকবে না?

ক। তবে সে দিন বামুনঠাকুর হাঁসের ডিমের ডান্‌লা

বাড়ীতে বসে থাকবি চল। অখাদ্যগুলো খেয়েছিস, একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেব। যাবি?”

রজনী রাজী হইল না। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে, মাটির ঘরে খড়ের ছাউনি মনে পড়িতেই তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল। সে এখন বাবু হইয়াছে। পম্পসু পায়ে দেয়। শিল্কের চাদরও একখানি সংগ্রহ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ অনেক অনুরোধ করিলেন। রজনী কিছুতেই শুনিল না। শেষে ব্রাহ্মণ বলিলেন, “এখানেই তবে থাক্। খাওয়া দাওয়া ত শুনছি ভালই হয়।”

র। কি রকম?

ব্রা। কর্ত্তা বলছিলেন পোলাও, লুচি, তপসে মাছ এই সব নাকি রান্না হয়।

র। কে বল্লে? হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাবুর সে দিকে অষ্টরম্ভা! পান্তাভাত নুন মেখে খেয়ে ঢেঁকুর তুলে বলেন, পোলওটার ঘি বেশী হয়েছিল, হজম হয়নি, ঢেঁকুর উঠছে। জল খাবারের সময় লুচি খান, তা আমার উপর হুকুম আছে টাকার মত ছোট ছোট চারিখানি লুচি তৈরি করে দিতে হবে। সখের মধ্যে হাঁসের ডিম খাওয়া, তাও যখন তিন পয়সায় দুটো পাওয়া যায়।

ব্রা। খাওয়া দাওয়া তা হলে সুবিধে নয়?

র। সুবিধে? অনবরত টিক্‌টিক্ করছে—এত খরচ হয়ে গেল, তত খরচ হয়ে গেল। একটা শিশিতে করে রাঁধবার তেল দেয়। তাতে ওষুধের শিশির মত দাগ মেরে দিয়েছে। রোজ এক দাগের ভেতর রান্না সারতে হবে। দুধ সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জ্বাল দিয়ে রাখান। সর পড়লে ঢাকা থাকে, পাছে আমি

খেয়ে ফেলি। আর কথায় কথায় জরিমানা হচ্ছে। বাড়ির সকলকার খাওয়া হয়ে গেলে কর্ত্তা এসে বলেন, "ঠাকুর, হাঁড়ি দেখি। যদি একমুঠো ভাত পড়ে থাকে অমনি চার আনা জরিমানা। বলেন, ঠিক তুই আন্দাজ করে চাল নিসনি। রোজ ভাত নষ্ট কচ্ছিস্।"

ব্রা। সেকি রে? সব দিন কি সকলে সমান খায়? একদিন কেউ এক মুটো বেশী খেলে, কেউ বা একমুটো কম খেলে।

র। তা কে জানে? বাবুর ঐ হুকুম। আর "বামুন বেটা সব চুরি করছে" এ বুলি ত মুখে লেগেই আছে।

ব্রা। দেখ্ দিকি, এ রকম অপমান সহ্য করে তোর থাকবার কি দরকার? চ' আমার সঙ্গে বাড়ী চ'।

কিন্তু রজনীবাবু বাড়ী কিছুতেই যাইবে না। তাহার প্রধান কারণ কলিকাতায় আসিয়া সে দুই একটি নেশা করিতে শিখিয়াছিল। আনুষঙ্গিক উপসর্গের কথাও মধ্যে মধ্যে শোনা যাইত।

উভয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ী যাইবার দিন কর্ত্তার কাছে বিনীতভাবে জানাইলেন যে কর্ত্তা যেন তাঁহার ছেলেটিকে দেখেন। সে একগুঁয়ে, কথা শোনে না। নহিলে তাহাকে দেশে লইয়া যাইতেন। কর্ত্তা মহৎ ব্যক্তি। মহদাশ্রয়ে সে যেন সুখে থাকে।

কর্ত্তা মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা। দেখব বই কি! তোমার কোনও চিন্তা নাই।"

আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় হইলে, কর্ত্তা গাঙ্গুলী মহাশয়কে বলিলেন "বুড়ো বেটা বদমাইসের জাসু, মায়াকান্না কাঁদতে এসেছিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে রজনী হুঁকাটি হাতে করিয়া বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত ও সেই রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী এক গলির ভিতর এক মুদীর দোকানে গিয়া বসিত। সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিত। বেলা আড়াইটা বাজিলে আবার হুঁকা হস্তে বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত।

একদিন এইরূপ ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় গাঙ্গুলী মহাশয় তাহাকে ডাকিলেন। রজনী তাহার কাছে গেলে বলিলেন "ওহে, একলা খেও না। আমাদেরও কাঁটাটা আস্‌টা দিও। নইলে টেঁক্‌তে পার্‌বে না।"

র। আজ্ঞে সে কি?

গা। আহা, যেন ন্যাকা! বলি, বাবুর বাজার কর, কোন্ না কিছু উপরি মার? তা নাও, নাও। কিন্তু আমাদের কিছু দিয়ে খেতে হয়, বুঝ্‌লে? আমরাও হামেসা বাবুর কাছে কাছে থাকি, বুঝলে? আর বাচ্ছা হাঁসের ডিমের কুসুম থাকে কিনা এ কথার সাক্ষী তুমি পাবে কোথায়?

এই বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

র। আজ্ঞে, আমাকে সে রকমের লোক মনে করবেন না। মনিবের পয়সা আমার গায়ের রক্ত।

গা। ওহে ওরকম বুদ্ধি কর না—প্যাঁচে পড়্‌বে। আচ্ছা, তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে।

এই বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আরও দুই তিন দিন গাঙ্গুলী মহাশয়

পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনীর চোটপাট জবাব শুনিয়া নিরস্ত হইয়া গেলেন।

ইহার পর কর্ত্তা ও গাঙ্গুলী মহাশয়ের মধ্যে কি চুপি চুপি পরামর্শ চলিতে লাগিল। বামুন ঠাকুরের গতিবিধির উপর গোপনে লক্ষ্য রাখা হইল।

একদিন দুধ জ্বাল দিয়া সর পড়িলে কর্ত্তা তাহা ঢাকা দিয়া রাখিতে হুকুম দিয়া বাহিরে আসিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল বামুন ঠাকুর রান্নাঘরের কপাট ভেজাইয়া দিল। কর্ত্তা ও গাঙ্গুলী মহাশয় অমনি জানালার পাশে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, বামুন ঠাকুর একটা পাঁকাটি বাহির করিয়া দুধের কড়ার ঢাকনি খুলিল ও সর একটু সরাইয়া পাঁকাটি দুধে ডুবাইয়া দিয়া মুখ দিয়া টানিতে লাগিল। সর যেমন তেমনি রহিল, দুধ পাঁকাটির ভিতর দিয়া বামুন ঠাকুরের মুখে উঠিতে লাগিল।

সহসা কর্ত্তা ডাকিলেন "ঠাকুর!" রজনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা বলিলেন "বেটা হারামজাদ! তাই ত বলি, দুধ যায় কোথা? তুমি যে হেথা বক-যন্ত্রের সাহায্যে ফিলটার করতে বসেছ তা বুঝব কি করে? গাঙ্গুলী, দাও বেটাকে আচ্ছা করে ঘা কতক দিয়ে দাও।" গাঙ্গুলী মহাশয় সানন্দে গায়ের ঝাল মিটাইয়া রজনীকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে রজনী হুঁকাটি লইয়া দ্বিপ্রহরে বাহির হইতেছে এমন সময় গাঙ্গুলী আসিয়া পথ রোধ ক'রল। কর্ত্তাও কোথা হইতে আসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে রামা চাকর। তাহার হাতে তামাকের কলিকা সাজা। সেই কলিকায় সে ফুঁ দিতেছে।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার হুঁকাটা একবার দাও ত। একটান তামাক খেয়ে নিই।"

রজনী। সে কি! এ হুঁকোয় আপনি কি করে খাবেন? আমি আপনার হুঁকো এনে দিচ্ছি।

গা। না, না। দাও না এইটেই।

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহা রজনীর হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। রামা কলিকা পরাইয়া দিল। রজনী চলিয়া যায়, কর্ত্তার ইঙ্গিতে রামা তাহার হাত ধরিল।

গাঙ্গুলী বলিলেন "বাঃ—ঠাকুরের খেলো হুঁকোটি ত বেশ। [illegible] মালাটি খুব বড়। তা ঠাকুর, মালার ভেতর জল না পুরে ঘি পুরেছ কেন? কলাপাতার ঠোঙ্গা করে গরম ঘি রোজ হুঁকোর মালায় ঢেলে নিয়ে গিয়ে ছিদাম মুদীর দোকানে [illegible] এস, আমরা বুঝি তা বুঝতে পারি না?" [illegible]ার এ[illegible] হুঁকার মালার ভিতর ঘৃত রহিয়াছে।

তখন কর্ত্তার আজ্ঞায় ভীষণ প্রহার দিয়া বামুন ঠাকুরকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল। গাঙ্গুলী মহাশয়ও চটিজুতা খুলিয়া দুই এক ঘা মারিলেন। রজনী প্রহৃত হইয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া পলাইয়া গেল।

রামা চাকর বলিল, "ওঃ—এত বড় চোর ত আমি কখনও দেখিনি। আগে যে বামুনটা ছিল সেও চুরি কর্‌ত বটে, কিন্তু সে সামান্য। হয়ত একটা বাটিতে ঘি ঢেলে ভাতের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌লে, কি দুখানা মাছ খেয়ে ফেল্‌লে। কিন্তু এ রকম—বাপ্‌—আমার চোদ্দপুরুষেও কেউ কখন দেখেনি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হইয়া দলে দলে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা শশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইতে-ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের আজ উপনয়ন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্যই দলে দলে ব্রাহ্মণগণ চতুষ্পাঠীতে আগমন করিতেছিলেন।

উপনয়ন হইয়া গেল। বৃহৎ আটচালায় ব্রাহ্মণভোজনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আসন, পাতা ও জল দেওয়া হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ উপনয়নসংস্কার কার্য্যে [illegible] ছিলেন। এবার আসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সকলেই প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর ভট্টাচার্য্য একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কই, রজনীকে দেখছি না যে? সে [illegible]?"

গদাধর ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীর সহিত শশিকান্তের চতুষ্পাঠীর প্রতিযোগিতা চলিত। কিন্তু শশিকান্তের চতুষ্পাঠীর সুনাম ছিল, কাজেই ছাত্রসংখ্যা অধিক। পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হইত। গদাধর তাই হিংসায় দগ্ধ হইতে থাকিতেন। শশিকান্তের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। শশিকান্তের পুত্র রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়াই গদাধর যখন তখন বিদ্রূপ করিতেন।

শশিকান্তও পুত্রের জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। তিনি দরিদ্র বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় বড়ই অভিমানপ্রবণ। কেহ যে কোন সূত্রে তাঁহার নিন্দা করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই তিনি এ

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুখুয্যে মহাশয়কে বলিলেন, "কই আপনার ছেলেকে আন্‌লেন না ?"

মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন "না, আজ সে তার দিদির বাড়ী গেছে।" গদাধর এই সময় আবার বলিলেন "শুন্‌ছেন ভট্টাচার্য্য মশায়, রজনী এয়েছে কি ?"

শশিকান্ত সংক্ষেপে বলিলেন "না।"

গ। সে এখন কোথায় আছে ?

শ। কলকাতায়।

...থায় কর্ম্ম করে ?

...পড়িলেন। তাঁহার পুত্র রাঁধুনীগিরি

...তাঁহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন মিথ্যা কথা বলিবেন, কিন্তু তখনই স্মরণ হইল জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি বড় সমস্যায় পড়িলেন। পাড়ার আর আর সকলে সকৌতূহলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

মুখুয্যেমহাশয় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন "রজনীকে খবর দিয়াছেন কি ? সে আজ আস্‌বে ত ? গাড়ীর সময় প্রায় হয়ে এল।"

শশিকান্ত রজনীকে পত্র দিয়াছিলেন। সে পত্র কলিকাতায় পৌছিলে কর্ত্তা গাঙ্গুলী মহাশয়কে তাহা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য রজনী তাহার পূর্ব্বেই সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, কাজেই সে পত্র পায় নাই।

শশিকান্ত বলিলেন "হাঁ।" প্রকারান্তরে ইহা মিথ্যা হইল। তিনি পত্র দিয়াছিলেন এ কথাটা সত্য, কিন্তু রজনী আজ আসিবে কিনা এ কথাটা তিনি জানিতেন না। এই "হাঁ" কথাটি বলিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

এই সময় শশিকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া বলিল, "আপনারা গা তুলুন। খাওয়ার জায়গা হয়েছে।"

ব্রাহ্মণগণ দলে দলে ভোজন স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই সময় নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। [illegible] গিয়াছে

শশিকান্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ত[illegible] বৃহৎ আটচালা ভরিয়া দলে দ[illegible] চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ পরিবেশন করিতে[illegible] যখন প্রায় অর্দ্ধেক সমাপ্ত তখন সহ[illegible] হইল। অল্পক্ষণ পরেই দুইজন কনষ্টেবল ও একজন জমাদার হাতকড়ি-বদ্ধ রজনীকে লইয়া শশিকান্তের গৃহপ্রাঙ্গনে আবির্ভূত হইল। রজনীকে এই অবস্থায় দেখিয়া পরিবারস্থ রমণীগণ রোদন করিয়া উঠিল। শশিকান্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন "একি ! কি হয়েছে ?"

জমাদার রুক্ষস্বরে বলিল, "আমরা কল্‌কেতা থেকে আস্‌ছি। এ কি আপনার ছেলে ? কল্‌কেতায় যদুবাবুর বাড়ী রাঁধুনি ছিল। একখানা রূপার বাসন চুরি করে বেচ্‌তে গিয়ে ধরা পড়েছে। আরও দুই একটা জিনিষ চুরি গেছে, আপনার বাড়ী খানাতল্লাস হবে।"

এই সময় গ্রামস্থ দারোগা দুইজন চৌকীদার সহ দর্শন দিলেন। যে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা

এই সময় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মুখুয্যে
শীঘ্গির আসুন। বাবা মূর্চ্ছা গেছেন।"
পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়ী ফিরিতে
র ঢং করে মূর্চ্ছা গেছেন। চোরাই মাল
বাড়ীতে [illegible] চালাকি নয়। বাছাধনকে শ্রীঘর দেখ্‌তে হবে।"

ইহার একমাস পরে গদাধরের চতুষ্পাঠীতে সমবেত ছাত্র-বৃন্দের নিকট গদাধর বলিলেন "ওহে তোমরা শুনেছ, আজ রজনীর তিন মাস মেয়াদের হুকুম হয়েছে। ভট্টাচার্য্য মশায় বহুকষ্টে অব্যাহতি পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। একে ত সেই পৈতের দিন থেকেই ভুগ্‌ছেন, তার পর আবার এই সকল হাঙ্গাম। কবিরাজ বলেছে, আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ।"

এই সময় গ্রামের অপর প্রান্তে শশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইতে শব্দ উঠিল "বল হরি! হরি বোল।"